মিলনের পথে।

উপন্যাস।



শ্রীবারীন্দ্রকুমার ঘোষ



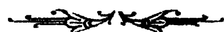
প্রকাশক—
শ্রীসরোজিনী ঘোষ।
৪।এ মোহন লাল ষ্ট্রীট্, শ্যামবাজার, কলিকাতা

মূল্য দেড় টাকা

১৩৩৮ সন।

প্রিণ্টার—শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ দে
মেট্‌কাফ্ প্রেস্
৭৯ নং বলরাম দে ষ্ট্রীট্, কলিকাতা।

উৎসর্গ।



আমার সেই বৌ-দিদির দু'খানি ছবি—মৃণালিনী ও

লতিকাকে তাঁ'দের কাকার আদরের

আশীর্ব্বাদী দান।

মিলনের পথে।



প্রথম পরিচ্ছেদ।

খেলা ধূলা।

দ্বারকেশ্বরের ঝিকিমিকি জল, আর নীল আকাশে সাদা সারিবাঁধা বকের পাল, যেন শ্যামাঙ্গ পূজকের শ্বেতচন্দনের রেখা। গোপীনাথপুর একখানি গণ্ড গ্রাম, মিত্তির পাড়া ও ফকিরডাঙ্গা এই দুইভাগে বিভক্ত। অধিকাংশ ব্রাহ্মণ কায়স্থের বাস এই মিত্তির পাড়ায়। গ্রামখানি হুগলি হইতে বর্দ্ধমান যাইবার পথে দ্বারকেশ্বর তটে অবস্থিত। ওপারে সবুজ বনে ঘেরা মসীদবেড়ের আঘাটা, স্নানার্থিণী কুললক্ষ্মীদের পায়ে পায়ে গড়া সরু সীঁথার মত পথটি বনের কোল দিয়া নদীর তটে আসিয়া পাড় বহিয়া নামিয়াছে। এপারে ঘাটের ঠিক উপরে জমিদার গোকুল মিত্রের অতিথিশালা ও ধবলগিরির মত প্রাসাদতুল্য বাটী। দ্বারকেশ্বরের জলে তাহার লাল ফটক ও শুভ্র অট্টালিকার বিপরীত ছবি নীলাকাশের গায়ে থর থর করিয়া কাঁপিতেছে। জল বড় নড়িয়া গেলে মিলাইয়া গিয়া পুনরুদিত স্বপ্নের মত জাগিয়া উঠিতেছে।

প্রশস্ত রাজপথ—উত্তরে বর্দ্ধমান ও দক্ষিণে মেদিনীপুর হইয়া

পূর্ব্বদক্ষিণমুখী হইয়া পুরী গিয়াছে। পথের ধারে প্রতি শুক্র ও মঙ্গলবার হাট বসে। হাটের অনতিদূরেই থানা ও পদ্মলোচন সাহার দোকান। দোকানের পরে শেখ মাদার বক্সের আম বাগানে শম্ভু ঘোষের গোয়াল; লাউলতাঘেরা গোয়ালের গোবর-নিকান উঠানটা মিত্রবাটীর পশ্চাদ্ভাগ। নদীর ধারে সদর ফটক হইতে বৈঠকখানা হইয়া লাল খোয়া বাঁধান পথ ঝিলের পাড় দিয়া নিত্যানন্দময়ীর নাটমঞ্চ ছুঁইয়া শম্ভু ঘোষের গোয়ালের দিকে খিড়কীর দরজায় বাহির হইয়াছে। এই পথে বাড়ীর মেয়েরা দ্বারকেশ্বর-স্নানে যায়। সদরে থেলো হুঁকা হাতে নায়েব গুড়গুড়ে ভটচায, বালির কাগজের মোটা মোটা তৌজি বহি লইয়া লিখনরত গোমস্তার পাল এবং লাঠি-বগলে ময়লা চাদর কাঁধে কত চাষাভুষার আনা গোনা।

আজকার কথা বলি। সবে সূর্য্যোদয় হইয়াছে। শ্বেতপাথরে বাঁধা ধবধবে ঘাটে উপু হইয়া বসিয়া গোকুল মিত্রের ভ্রাতুষ্পুত্র মতি পকেট হইতে লজঞ্চুস, মারবেল, রঙ্গিন সুতা, ম্যাঞ্চেষ্টারী থানের ছবি এমনি কত কি একে একে বাহির করিতেছিল, আর একটি ছোটখাট মোমের পুতুলের মত মেয়ে ও দুইটি নগ্নপদ মালকোচামারা ছেলে হাঁটু গাড়িয়া সেই সব রহস্যমাখা বস্তুর মুহুর্মুহু চেতনাহারী আবির্ভাব কলরব করিতে করিতে দেখিতেছিল। জমিদার বাটীর ছেলে মতির বড় জাঁকজমকের পোষাক ও পায়ে জরির জুতা। সঙ্গে ঝাঁকড়া-চুল চাকর আকাল, আকালও ছেলে মানুষ।

ছেলেরা মাঝে মাঝে "সুঁদি, অ সুঁদি, দেখবি আয়" বলিয়া জলে সন্তরণশীলা যে মেয়েটীকে ডাকিতেছিল তাহার নাম সুন্দরী—ওপারের মসীদবেড়ের বৃন্দাবন ঠাকুরের কন্যা। সুঁদি সবে আটে পা দিয়াছে, এই বয়সেই টানা টানা বড় চোখ ও মুখশ্রীতে সে পটে আঁকা দুর্গাঠাকরুণটি।

ঘাটের উপরের মেয়েটি ইন্দিরা—ডাকনাম টেঁপী, এপারের কার্ত্তিক দত্তের মেয়ে। মতির সঙ্গী ছেলে দু'টি রামতারণ ও পাঁচু, দু'জনেই ব্রাহ্মণের ছেলে, দু'জনেই এই গাঁয়ের।

মতির পকেট হইতে একটা লাল ও কালো রঙের টিনের রেলগাড়ী স্বায় এঞ্জিন সমেত বাহির হইয়া আসিতে দেখিয়া টেঁপী হাততালি দিয়া ঘুরিয়া ঘুরিয়া বার কতক নাচিয়া আহ্লাদের জ্বালায় ই-ই-ই-ই-রবে একটা ডাক ছাড়িল।—"এ সুঁদি, শীগ্গির দেখবি আয়।" (জল হইতে) "বয়ে গেছে"।

ইহারা সকলে মধ্যবৃত্ত গৃহস্থের ঘরের সন্তান; রথ বা দোলের দিন কেনা দুই একটা বাঁশী, ভেঁপু বা কাঠের ঘোড়া বই আর কিছুই চক্ষে দেখিতে পায় না। তাই সকলে মিলিয়া মতির মোসাহেবী করে, তাহার এঞ্জিন,বন্দুক, কলের জাহাজ প্রভৃতি দেখিয়া দেখিয়া একটু ঈর্ষ্যা-মিশ্রিত আহ্লাদে শিহরিতে থাকে। কেবল সুঁদি—দুঃখী বৃন্দাবনের মেয়ে ঠ্যাকারে একগুঁয়ে সুঁদি বিলক্ষণ ঘুসঘাস না পাইলে এ দলে ঘেঁসিতে চায় না, অনেক কাকুতি মিনতি করিয়া লজঞ্চুস্ মার্ব্বেল ভেট দিয়া নিত্য তাহাকে নূতন করিয়া এই মোসাহেবীতে ভর্ত্তি করিতে হয়। বন্দুক এঞ্জিনে যত সুখই হউক না কেন, সুঁদি নাক বাঁকাইয়া পিঠ ফিরাইয়া এই অভিনব বৈভবের অনাদর করিলে দুঃখ যে ততোধিক।

হঠাৎ মসীদবেড়ের আঘাটা হইতে "হৈ" করিয়া একটা চিৎকার উঠিল, সঙ্গে সঙ্গে কে উঁচু পাড় হইতে লাফাইয়া জল তোলপাড় করিয়া নদীতে পড়িল।

ম। অ সুঁদি! ঐ বখাটে রেধো আসচে রে। তুই উঠে আয়।

রাম। ও যাক্ গে। নাও তুমি ভাগ কর।

ঝুঁ। নাহ্! সিদিনকে বাড়ী বয়ে দি আসবি বলে ওর ভাগ ঠকিয়ে মেরে দিয়েছিলি।

নি। আমি বুঝি মেরে দিয়েছিলুম,—য্যাঁ! বা রে! আকালীকে জিজ্ঞেস কোরো দিকিন।

পাঁ। মতিদা' জিজ্ঞেস আর করেনি? সে বল্লে তুই খেয়ে ফেলিচিস। আকাল, বলতো?

আ। হেঁ।

ঝুঁদি সন্তরণ করিতে করিতে এলো চুলের তরঙ্গ তুলিয়া মুখে জল লইয়া সূর্য্যালোকে রূপার ফুলঝুরি রচনা করিতেছিল। যখন ঝপাৎ করিয়া দূরে রাধু জল টালমাটাল করিয়া নদীতে পড়িল, তখনও তাহার ভ্রূক্ষেপ নাই। মতির ডাকে কিন্তু সে আর থাকিতে পারিতে ছিল না, তবু যাই যাই করিয়াও রাধুর ভয়ে ইতস্ততঃ করিতে ছিল।

রাধু মসীদবেড়ের রামধন বস্থর ছেলে, বড় দুর্দ্দান্ত ও বখাটে, গাঁয়ের যত মায়ে-খেদান বাপে-তাড়ান তামাকখোর "দস্যি" ছেলের পালের গোদা। এমন ছেলে এ গাঁয়ে খুব কম ছিল যে রাধুর হাতের ধনঞ্জয় চিল ডাকিতে ডাকিতে হজম করে নাই, অবশ্য পাঁচু ও মতি বাদে। পাঁচু দেহের বলে রাধুকে পিষিয়া মারিতে পারে; আর মতি জমিদার বাড়ীর ছেলে, তাহার নাগাল পাওয়া দায়। বিশেষতঃ মিত্তির বাড়ীর আম চালতা নারকেল কুলের লোভে রাধুকে দ্বারবান পাঁড়ে চৌবে গোষ্ঠির সহিত দহরম মহরম রাখিতে হয়, পাঁড়ে সন্তানেরাও জুতা পোঁটি ও বাটুয়া চুরি যাইবার ভয়ে সদা তটস্থ, তাহারাও দর্শনমাত্রে "কেয়া বাবুয়া! আও লালা, বৈঠো" রবে বিকসিতদন্তে তাহার সম্বর্দ্ধনা করে।

দিন নাই রাত নাই খাটিয়া খুটিয়া মেজাজটা একটু রুক্ষ হইলেই জগদম্বা ঠাকুরাণী মেয়েকে চড়টা চাপড়টা কসাইয়া দিয়া বলেন

"হতচ্ছাড়ী! তুই হ'লি গে ঘুঁটে-কুড়ুনীর মেয়ে; তোর লিড়বিড়ে ষাঁড়ের নাদ বাপের ঐ দু'ঘর শিষ্যি সেবক নিয়ে নাচন কোঁদন। তোর বড় লোকের ঠ্যাকারে ছেলের সঙ্গে নদী সাঁতরে খেলতে যাওয়া কেন লা? ওরা ঘেন্না করবে যে! আর অমন শিবতুল্য বাপের কুপুত্তুর বখাটে গাঁজাখোর রেধো গুয়োর বেটা, ওর সঙ্গে দিন নেই রাত নেই টৌ টৌ-করে ঘুরিস্, পিরবিত্তিও হয়?" কাজেই পারত পক্ষে মায়ের সামনে সুঁদি রাধুর সহিত কথা বলে না।

একরত্তি মেয়ে হইলেও সুঁদি বয়সের অধিক পাকা। তাহার পাকামীর অনেক লক্ষণ। গ্রামের জা ননদ বৌ ও মাসী পিসিরা চুল বাঁধিবার আসরে বা স্নানের ঘাটে রূপের হাট বসাইয়া পুঁটি সরী ভুঁদী বামার ঠ্যাকার পিরবিত্তির কাহিনী বলিতে আরম্ভ করিলে, সে হাটে আট বৎসরের সুঁদি আসিয়া পাকা গিন্নীর মত মাথায় কাপড় দিয়া দাঁড়ায়; কথায় কথায় গালে চিবুকে আঙ্গুল রাখিয়া চক্ষু কপালে তুলিয়া "ওমা কি হবে গো", "তাই নাকি গো!" প্রভৃতি টিপ্পনী এমন গুরুগম্ভীর চালে বলে, যে হাটের সিমন্তিনীরা হাসিয়া কুটি পাটি হয়।

এইরূপ ভরা হাটে কোন পরপুরুষ দৈবাৎ আসিলে অন্যান্য বধূর ন্যায় সুঁদিও এক হাত ঘোমটা টানিয়া দুড় দুড় করিয়া পলাইত, কেহ চিমটি কাটিয়া অপাঙ্গে ইহার প্রতিবাদ করিলে সে নাক মুখ ঘুরাইয়া তর্জ্জনী গালে রাখিয়া বলিত, "ওমা! কথার ছিরি দেখ! উনি যে আমার ভাসুর হল গো", অথবা "মাগো মা! কি ঘেন্নার কথা! পর-পুরুষ যে! তোদের কি লাজলজ্জা নেই লা?"

কোথায় শঙ্খচিলের বাসায় ডিম পাওয়া যায়, কি করিয়া নদীর ধারে পাঁকের গর্ত্তে ন্যাকড়া জড়ান লাঠির আগা ঢুকাইয়া দিলে তাহাতে

মরণ কামড় লাগাইয়া টানে কাঁকড়া বাহির হইয়া আসে, কোন্ গাছের পাতায় মশাল ধরাইয়া ধোঁয়া দিলে মধু ফেলিয়া মৌমাছির ঝাঁক উড়িয়া পলায়, কখন বগলা পিসি মালা হাতে দাওয়ায় বসিয়া ঝিমাইলে হেঁসেলের পিছনের কাঁচা মিঠে আম পাড়া যায়, কিরূপে হুবহু শেয়াল ডাকিলে দত্তদের বাটীর কুকুরগুলা সমস্বরে আকাশ ফাটাইয়া ঘেউ ঘেউ করিতে থাকে ইত্যাদি ঊনপঞ্চাশ তত্ত্ব তাহার নখাগ্রে। তাই মতির দলে তাহার এত দর। তাই মাঠে মাঠে টো টো করিয়া রাধুর চেলা-গিরি করা তাহার একান্ত আবশ্যক।

চার পাঁচ দিন এ গাঁ সে গাঁ বখামি দস্যিপনা করিয়া রাধুর বন্ধুত্বের টিকিতে একবার করিয়া টান পড়িত, তখন সে হঠাৎ হাজির হইয়া তোষামোদে বা ছলে বলে কোন প্রকারে সুঁদিকে পাকড়াও করিয়া সমস্ত দিনের জন্য উধাও হইত। মায়ের নিকট ভবিষ্যতে ইহার জন্য মর্ম্মান্তিক খিমচি কানমলা খাইবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা সত্ত্বেও সুঁদি এ বন-ভ্রমণের প্রচণ্ড লোভ ছাড়িতে পারিত না।

সেই শিক্ষাগুরু রাধুদা' আসিতেছে! "হৈ" করিয়া ঐ হাঁকের মানে আর কিছু নহে, একটা দুঃসাহসিক কাজে আজ সুঁদির ডাক পড়িয়াছে। কিন্তু মতিদাও যে ডাকে! এতক্ষণ ইতস্ততঃ করিবার ফলে রাধু কাছে আসিয়া পড়িয়াছিল, এখন পথ আগলাইয়া বলিল, "ওরে সুঁদি আজ মশানচরে যেতে হবে।" সুঁদি যাইবেই ত, তবু কেমন স্বভাববশে মাথা ঝাঁকি দিয়া বলিল, "না, মা বকেচে। তুমি বখাটে, আমি তোমার সঙ্গে যাব না। আমি যে সোমখ মেয়ে, আজ বৈ কাল সিঁথেয় সীঁদুর পড়বে।

রা। যা, পাকামী কত্তে হবে না; পাজি ছুঁচো বাঁদরী।

সুঁ। (এক হাত ঘোমটা টানিয়া) যাও, আমি যাব নাক।

রা। তোর হাড় যাবে।

সুঁ! আচ্ছা, কে যায় দেখা যাবে। গাল দেওয়া আবার! য়্যাঁ!

সুঁদি সাঁতরাইয়া ঘাটে মতির কাছে চলিল। রাধু জল হইতে একবার গলা উঁচু করিয়া ঘাটের উপর দেখিল, তাহার পর ডুব দিয়া দুই হাতে একতাল কাদা তুলিয়া ছুঁড়িয়া মারিল, ঘাটের উপরে লজঞ্চুস ছবি সুতা রেলগাড়ী মতির পায়ের জরির জুতা ইন্দিরার নাক মুখ চুল সাড়ি সব পাঁকে পাঁক হইয়া গেল। ফলে একটা হৈ চৈ পড়িয়া গেল। রামতারণ অতটুকু বয়সের তুলনায় আশ্চর্য্য দক্ষতার সহিত নানা অকথ্য কুকথ্য কথায় গালি পাড়িতে লাগিল, মতি ও ক্যাঙ্গালী ইটপাটকেল চেলা কাঠ যে যাহা হাতের কাছে পাইল লইয়া রাধুর মাথা লক্ষ্য করিয়া বাঁই বাঁই শব্দে ছুঁড়িতে লাগিল। ইন্দিরা লজঞ্চুস ও কাপড়ের শোকে ভ্যা করিয়া কাঁদিয়া ফেলিল।

সুঁ। ছি! তুমি বড় বদ, ছোটলোক। ইন্দী ঘরের সোমথ বউ, তার গায়ে কাদা দিলে কি বলে? লোকে কি বলবে?

রাধু ইট পাটকেল হইতে মাথা বাঁচাইতে ডুব দিল, অমনি "বাবা গো—" বলিয়া একটা আর্ত্তনাদ উঠিয়া জলের তোলপাড়ের মধ্যে মিলাইয়া গেল। মতি কোঁচার খুঁটে ইন্দিরার চক্ষু মুছাইতে মুছাইতে নদীর দিকে চাহিয়া দেখিল রাধু বা সুঁদি কেহ কোথায়ও নাই; আবর্ত্তিত জল কেবল পাক খাইয়া খাইয়া বৃত্তাকারে বাড়িয়া চলিয়াছে। অনেকক্ষণ পর প্রায় মাঝ নদীতে তাহারা দুইজনে ভাসিয়া উঠিল। রাধু ডুব সাঁতার কাটিয়া সুঁদির পা ধরিয়া টানিয়া লইয়া গিয়াছে! সুঁদি আরক্তমুখে হাঁপাইতেছিল, আর রাধু আয়ত চক্ষু নাচাইয়া নষ্টামীর হাসি হাসিতেছিল।

রা। কেমন বাঁদরী? আসবিনে না? আমি না বখাটে?

সুঁদি প্রাণপণ বলে চটাস্ করিয়া তাহার গালে এক চড় হাঁকরাইয়া দিল। মসকদংশন তুল্য সেই তুচ্ছ প্রহারে দৃক্‌পাত না করিয়া রাধু তাহার চুলের মুঠি ধরিয়া মসীদবেড়ের ঘাটে ভাসিয়া চলিল। আঁচ্‌ড়াইয়া কামড়াইয়া চিমটি কাটিয়া রাধুকে রক্তাক্ত করিয়া সুঁদি হার মানিল, চুলে বিষম টান সহিতে না পারিয়া বলিল, "তোমার পায়ে পড়ি, ছেড়ে দাও।"

রা। পালাবি নে?

সুঁ। না। য়্যা—য়্যা—য়্যা—না—য়্যা।

রা। মাইরি?

সুঁ। মাইরি—য়্যা—য়্যা—য়্যা।

রা। মকরঘাটার শিবের দিব্যি?

সুঁ। মকরঘাটার শিবের দিব্যি। তুমি অলপ্পায় যাও, নিব্বংশ হও; ড্যাকরা একলসেড়ে মিন্সে,—য়্যা—য়্যা আমার চুলে লাগে না বুঝি—য়্যা!

রাধু তাহাকে ছাড়িয়া দিল। ঘাটে উঠিয়া চুল ঝাড়িয়া কাপড় নিংড়াইয়া সুঁদি রাগে ফুলিতে ফুলিতে বলিল, "আজ যখন দিব্যি করেচি তখন যাব, কিন্তু আর কখ্‌খন যদি তোমার সঙ্গে যাই- "

রা। যাবিনে? আচ্ছা, আচ্ছা—

সুঁ। তুমি বড় বদ, বড় মারো। গোঁয়ার চাষা থ্যাঙরামুখো—

হঠাৎ দূরে কলসি-কাঁখে জগদম্বা ঠাকুরাণী রূপে পথ আলো করিয়া দেখা দিলেন। ভয়ে সুঁদি তাড়াতাড়ি জলে নামিয়া রাধুর দিকে পিঠ করিয়া কুলকুচা করিতে লাগিয়া গেল। রাধু বলিল, "ওরে সুঁদি, চল পালাই। তোর মা ডাইনীটা আসচে!" সুঁদি মায়ের চক্ষের উপর এরূপ ঘনিষ্ঠতার লক্ষণ দেখাইবার অপরাধে একবার একটু ফিরিয়া মুখ

ভেঙচাইয়া রাধুকে নীরব তিরস্কার করিয়া আবার মুখ ধোওয়ায় গভীর মনোনিবেশ করিল।

জগ। রেখো অলপ্পেয়ে না? দাঁড়া ড্যাকরা ছোঁড়া—

রাধু সেই ভিজা কাপড় সমেত সুঁদিকে কাঁধে উঠাইয়া বনের দিকে ঘোড়ার মত ভোঁ দৌড় দিল। জগদম্বা ঠাকুরাণী অগত্যা ফ্যাল ফ্যাল চক্ষে ক্ষণেক চাহিয়া থাকিয়া গালি পাড়িতে পাড়িতে জলে নামিলেন।

যেখানে গিয়া হাঁপাইতে হাঁপাইতে রাধু সুঁদিকে নামাইল তাহা মসীদবেড়ের মকরঘাটার শিবের ভাঙ্গা বিগ্রহহীন মন্দির। রাধু পিছু দিকে দুই হাতের ভরে বসিয়া পা ছড়াইয়া হাঁপাইতে লাগিল, সুঁদি ঠোঁট ফুলাইয়া গোঁজ হইয়া বসিয়া রহিল। খানিক জিরাইয়া রাধু বলিল, "তোকে আজ ঐ চরের মধ্যে হাড়গোড় ভেঙ্গে পুঁতে রেখে যাব। রাধু সদ্দারের কথার অবাধ্য, তোর এত বড় আস্পর্দ্ধা?"

সুঁ আজ যাব, আর কখ্খন যাব না। (পিঠের কাপড় সরাইয়া) এই নাও, মার।

রাধুর সুন্দর মুখ রাগে রাঙ্গা হইয়া উঠিল, সে মারিতে উঠিয়া হঠাৎ দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া শুইয়া পড়িল। তখন সুঁদি দাঁড়াইল, হাসি মুখে কাপড় নিঙড়াইল, আধভিজা চুলের নুড়ি খুলিয়া ঝাড়িয়া রোদে এলাইয়া দিল; তাহার পর একবার আড়চোখে রাধুর দিকে দেখিয়া তাহার দিকে পিঠ করিয়া গুন গুন স্বরে গান ধরিল— 'ওলো তোর নাগর এল না'। আরও দুই একবার আড়চোখে দেখিল, কিন্তু রাধু উঠে না; তেমনি স্তব্ধভাবে পড়িয়া আছে। সুঁদি বড় অস্থির হইয়া বার কয়েক তাহার চারিদিকে পাক খাইল, আঁচল কোমরে জড়াইয়া বাঁধিল, শেষে আর থাকিতে না পারিয়া পার্শ্বে বসিয়া পড়িয়া রাধুর মুখের উপর হইতে হাত সরাইবার জন্য টানাটানি আরম্ভ করিয়া দিল। বিনাইয়া বিনাইয়া

বলিতে লাগিল, "তোমার দু'টি পায়ে পড়ি রাধুদা'। আমি যাব গো যাব, মাইরি বলচি, যাব!"

রা। (মুখ তুলিয়া) মোতে শালার সঙ্গে কথা কবিনে?

সুঁ। য়্যাঁ, তাই বুঝি হয়। মতিদা' যে ধরে নে যায়।

রা। (মুখ গুঁজিয়া) তবে যা!

এ মান কিন্তু বেশীক্ষণ টিঁকিল না। তখন দু'জনে কোমর বাঁধিয়া শ্মশানের বনে গিয়া গাবগাছে চড়িয়া টিয়ার বাচ্চা পাড়িল। গাছ হইতে রাধু বলিল, "কাল নলঘাটা থেকে ওরা তোকে দেখতে আসবে, না?"

সুঁ। হুঁ।

রা। নলঘাটা জানিস্? সেখানে এত্ত বড় কুমীর, ঘাটের কচুবনে দিনের বেলা বাঘ ওৎ পেতে বৌ ধরে নে যায়। তোর ঘাড় মুড় ভেঙ্গে খেয়ে ফেলবে।

সুঁ। (সভয়ে) ওমা! কে বল্লে?

রা। তা' না তো কি? মোট্‌রোর বোনের কথা শুনিস্ নি? তাকে বেহ্মদত্তি ধরে বাবলা গাছে টাঙ্গিয়ে দিয়েছিল। সেই যে সিদিনকে শম্ভুদা' গল্প কর্‌লে।

রাধু নামিয়া আসিয়া চুপি চুপি কি বলিল, সুঁদি গম্ভীরভাবে ভাবিল, তাহার পর মাথা নাড়িয়া বলিল, "না, মা বড্ড মারবে।" শেষে একটা পরামর্শ ঠিক হইল। তখন দু'জনে চক্কোত্তি মশাইয়ের গোয়ালে ঢুকিয়া বাঁধা বাছুর ছাড়িয়া দিয়া পলাইল, রাধুর বাপের বাক্স হইতে চুরি করা পয়সা দিয়া তিলের মোয়া কিনিয়া খাইল, শেষে আবার সাঁতরাইয়া দ্বারকেশ্বর পার হইয়া ভরা দ্বিপ্রহরে শম্ভু ঘোষের বাটির পিছনে আসিয়া উপস্থিত হইল! রাধু কচুবনে লুকাইয়া রহিল, আর সুঁদি পোড়ারমুখী ঘুরিয়া সদর দরজা দিয়া নিতান্ত সাদাসিদা ভাল মানুষের মত ঘরে

ঢুকিয়া মাদুরে শোয়া শম্ভুর শিয়রে গিয়া বসিল, বলিল, "বাহবা! শুমো ঠাকুরদা, এখনি ঘুম? তুমি কি কুম্ভকর্ণ নাকি গা? পাকা চুল তুলে দেব?"

শ। কে ও, সুঁদি বামনী? তা' দে না দিদি।

সুঁ। হরিমনী মাগী কোথা?

শ। হাটে গেছে গো।

সুঁ। একটা গল্প বল না, গয়লাঠাকুর্দ্দা'।

শ। কি গল্প শুনবি, গোভূত আর নলাখী রাজার?

সুঁ। না, ঠাকুরমাকে হরে আনবার গল্প বল।

সুঁদি জানিত এই প্রসঙ্গ আরম্ভ হইলে শুমো ঠাকুর্দ্দার বাহ্যজ্ঞান থাকে না। শম্ভু উৎফুল্ল মুখে তাহার দিকে কাৎ হইয়া ফিরিল, গদগদ স্বরে বলিল, "সে কি আজকের কথা গো? আমি তখন গে ঐ সুদো-ধোপার আটচালা ঘরে বাস করি। দেখিচিস্ না দিদিমণি, আমার হরিমণীর কেমন ডাগর ডাগর হরিণের পারা চোখ, তার তেমনি ছেল। সে বচ্ছর বড্ড আকাল আর মড়ক। বর্দ্ধমান গেলুম। সে এই দেখ না যেমন তেমন করে হোক বার বচ্ছর হ'ল। তা' আর হবে না? সে কি আজকের কথা গা? সেই যখন দত্ত বাবুদের বুড়ো বট বাজ পড়ে চৌচির হয়ে যায়, সেই বচ্ছর আমার বুধি গাই মরে। প্রথম তারে যখন দেখনু তখন ছাতুবাবুদের ঘাটে বাসন মাজতেছেল, আহা ঘাট যেন আলো করে ছ্যাল।"

শম্ভু রুদ্ধকণ্ঠে উঠিয়া বসিল, নীরবে হুঁকা ধরিয়া টানিতে লাগিল। ক্ষণেক পর নিশ্বাস ফেলিয়া আবার আরম্ভ করিল, "সেই তো দেখে এসে সিতুর কাছে আটকুড়ি টাকা হাওলাৎ নিয়ে এই ঘুর বাঁধলুম, আর নলঘাটার মেলায় মঙ্গলাকে কিনলুম। আহা! চেনে না, জানে না,

আমার একটা মুখের কথায় ভাই ভগ্‌গোর আত্ম কুটুম ছেড়ে জন্মের শোধ চলে এল।”

শম্ভুর গলা ধরিয়া আসিয়াছিল; ততক্ষণে রাধু এক কোঁচড় লিচু পাড়িয়া তিনটা বাছুর ছাড়িয়া দিয়া কচু বনে উপু হইয়া গিয়া বসিয়াছে। বাছুর কয়টা হুটোপাটি করিতে করিতে বাহির হইতেছে।

সুঁ। শুমোঠাকুরদা', তোমার বাছুর ছেড়ে গেছে যে।

“খ্যাঁ! কৈ? হেত্তোর—হ্যাট্ টে টে—” শম্ভু উঠিয়া বাছুর ধরিতে গেল। “শুমো ঠাকুরদা, আমি গেলাম গো” বলিয়া সুঁদি সরিয়া পড়িতে গিয়া শুনিল, রাস্তার উপর হইতে এক পাল ছেলে মেয়ে সুর করিয়া তারস্বরে আবৃত্তি করিতেছে—

গঙ্গাফড়িং শুমো
কচুবনে ঘুমো;
ঠ্যাং ধরেচে ফিঙে
ফুঁকলো এবার শিঙে।

সুঁদি প্রমাদ গণিল। প্রত্যুৎপন্নমতি রাধু দেখিল তাড়া খাইলে ছেলের দল তাহার কচুবন দিয়াই পলাইবে, তখন তাহার বামাল ধরা পড়া একরকম সুনিশ্চিত। সে আগে ভাগে এক কাঁঠাল গাছে গিয়া উঠিল। অবিলম্বে অগ্নিমূর্ত্তি শম্ভু বাঁক হাতে বাহির হইল, “গঙ্গাফড়িং এলো রে” রবে ছেলের পাল দিগ্বিদিকে ছুটিল। সচল তালবৃক্ষ শম্ভু ঘোষ তাহার আকারসদৃশ গঙ্গাফড়িং নাম শুনিলে তেলে-বেগুনে জ্বলিয়া যাইত। বেড়া ডিঙাইতে পড়িয়া গিয়া যে ধরা পড়িল সে মতি; মতি ছড়া কাটে নাই, রাগে বিচারবুদ্ধিহীন শম্ভুর হাতে অবশ্যম্ভাবী প্রহার এড়াইতে মাত্র পলাইয়াছিল। শম্ভু তাহার চুলের মুঠি ধরিয়া যে গাছের তলায় তাহাকে বাঁক পেটা করিল সেই গাছের উপর লিচুর

পোঁটলা বগলে রাধু শাখামৃগ দশায় আসীন! চিৎ হইয়া বাঁকের উত্তম মধ্যম মুখ বুঁজিয়া পরিপাক করিতে করিতে মতি "তাহা দেখিল, তবু পড়িয়া মার খাইল। সুঁদি কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়া হইয়া খানিকটা মুখে আঙ্গুল পুরিয়া হাঁ করিয়া দাঁড়াইয়াছিল। তাহার পর ছুটিয়া গিয়া নিজের অঙ্গ দিয়া মতিকে ঢাকিয়া তাহার উপর হুমড়ি খাইয়া পড়িল। দুই এক ঘা মারিবার পর সামলাইয়া শম্ভু বাঁক ফেলিয়া দিল, অনুতপ্ত হইয়া বলিল, "আহাহা! আমার দিদিমণিটারে মেরে ফ্যাল্‌লাম যে, তুই কোথাত্তে? ও হারামজাদা গুয়োর বেটারে ছাড়্, আমি একবার মনের সুখে পিটিয়ে মাটিসই করে নি।"

সুঁ। ও যে জমিদার বাড়ীর ছেলে, চিনতে পাচ্ছ না।

"যঁ্যা"! বলিয়া শম্ভু বাঁক ফেলিয়া প্রাণ লইয়া পলাইল। শম্ভুকে ইহার পর তিন দিন কেহ এ অঞ্চলে দেখিতে পায় নাই। মতি কিন্তু প্রহারের কথা বাড়ীতে বলে নাই। ভবিষ্যতে লিচুর লোভ তাহাকে নীরব রাখিয়াছিল। বলিলে শম্ভুর ভিটে উঠিত।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

সুঁদির বিয়ে—সূত্র ছিঁড়িল কি গড়িল।

আজ সুঁদির বিবাহ। রাত বারটার পর লগ্ন। সুঁদির পিতা বৃন্দাবন ঠাকুর আজ বৎসরাবধি নিরুদ্দেশ, তাই তাঁহার স্যাঙাৎ রামবসুর গৃহে বিবাহের আসর বসিয়াছে। গৃহে সানাইয়ের বাদ্য, আলো ও কলরব এবং দরজায় কদলি ও মঙ্গলঘট। বৃন্দাবনের জীর্ণ কুঁড়ে ঘর খানিতে মেয়েদের আড্ডা, তাহাও আজ এত চাঁদমুখের রূপে আর উৎসবশ্রীতে জলজল করিতেছে।

বৃন্দাবনের গৃহত্যাগের কথা বলিতে গেলে অনেক গোড়ার কথা বলিতে হয়। ইহাদের আদিম নিবাস নদীয়া জেলার কর্ণপুর গ্রামে ছিল। সেখানকার জমিদার রামনাথ চৌধুরীর অর্থবলে ও তাড়নায় বশ হইয়া বহুপণ্ডিত এক অশাস্ত্রীয় ব্যবস্থা দিতে বাধ্য হয়। কেবল তেজস্বী বৃন্দাবন তাহা না করিয়া কর্ণপুর হইতে বাস উঠাইয়া মসীদ বেড়েয় আসিয়া বসেন। এখানে তাঁহার সম্বলের মধ্যে তিন বিঘা ক্ষেত ভুঁই, একটি চালা ঘর ও নন্দকিশোর বিগ্রহ; এটি কিশোর কৃষ্ণের ত্রিভঙ্গিম মুরলীবাদক পাষাণ মূর্ত্তি। তাঁহারা এ গ্রামে নূতন, সুতরাং দশ বার ঘর ব্যতীত যজমান বড় একটা জুটিল না; যাহারা জুটিল তাহারাও আবার দূরদেশে,—কেহ বনবিষ্ণুপুরে, কেহ বর্দ্ধমানের অন্তর্গত মানুগঞ্জে এবং কেহ বা মেদিনীপুরস্থ ঘাটাল ও চন্দ্রকোনায়।

বৃন্দাবনের ছিল লম্বা দোহারা গৌরবর্ণ চেহারা ও সদাহাস্যপরায়ণ এবং বড় আমুদে প্রকৃতি। কেথায়ও হরিসঙ্কীর্ত্তন, কবির লড়াই বা যাত্রার কথা শুনিলে বাটীতে তাঁহার চুলের টিকিটি আর দেখা যাইত না ; এই ভবঘুরে স্বভাবের জন্য জগদম্বার নিকট তাঁহাকে নিত্য গালি খাইতে হইত। জগদম্বা ঠাকুরাণী এ গ্রামে ডাকসাইটে সুন্দরী, ছেঁড়া শততালিযুক্ত সাড়ি পরা মলিন অঙ্গখানিতে রূপ কানায় কানায় ভরিয়া উছলিয়া পড়িতেছে। কিন্তু ঠাকুরাণী বড় মুখরা ও উচিৎবক্তা, তাঁহার কটুকাটব্য ও ব্যঙ্গোক্তির জ্বালায় এ গ্রামে তাঁহার নাম ছিল ছোট কুঁদুলী। পত্নী দূরস্থ যজমান বাটী যাইবার তাগাদা আরম্ভ করিলে প্রসন্ন সরল হাস্যে বৃন্দাবন বলিতেন, "ঘরে নন্দকিশোর রয়েচেন, আমাদের ভাত মারে কে ?"

জগ। হ্যাঁ, যা' ভক্ত পেল্লাদ তুমি। যত রাজ্যের কুড়ে লিড়বিড়ের ভাত যোগাবেন না ত ঠাকুর আর করবেন কি ? তোমাকে উঠনো খাওয়াবেন বলে বৈকুণ্ঠে ঠাকুর মুদিখানা খুলে বসেচেন আর কি।

বৃন্দা। ঠাকুর ত আছেনই, আবার লক্ষ্মীরও বড় দয়া গো। আমার মত কাঙ্গালের ঘর দেখে দেখেই তো আসেন। এই দেখনা কে আমার কুঁড়েখানা উজ্জ্বল করে রয়েচে।

বৃন্দাবনের চক্ষের সে মুগ্ধ পূজা দেখিয়া জগদম্বা আর রাগিতে পারিতেন না। স্বামীসোহাগে ভাগ্যবতী অশ্রুনেত্রে কার্য্যান্তরে চলিয়া যাইতেন। সুন্দরী এই ব্রাহ্মণ দম্পতির একমাত্র সন্তান, নন্দকিশোরের দুয়ার-ধরা মেয়ে। বৃন্দাবন বড় মধুর খোলবাদক ছিলেন, কোথায়ও গানের বৈঠক বসিলেই তাঁহার ডাক পড়িত। বৃন্দাবন দশ বৎসর নিঃসন্তান ছিলেন, তাঁহায় পুত্রলাভের একান্ত সাধ মিটাইতে না পারিয়া জগদম্বা নন্দকিশোরের দুয়ারে হত্যা দিয়া পড়িলেন। উপবাসের তৃতীয়

রাত্রে বৃন্দাবন স্বপ্ন দেখিলেন যেন এক গৌরকান্তি অপরূপদর্শন যোগী একটি সদ্যপ্রসূতা কন্যাকে তাঁহার কোলে দিয়া বলিতেছেন, "এই নিয়ে বেটার সাধ মিটা, তারপর আমায় দিস্।" তাহার পর সুন্দরীর জন্ম। এত বড় সাধে ছাই দিয়া কন্যা হইতে দেখিয়াও তাই বৃন্দাবন "নন্দ-কিশোরের ইচ্ছা" বলিয়া তাহাকেই কোলে তুলিয়া লইলেন। তাঁহার পুত্রের সাধ সুন্দরীকে দিয়া কতক মিটিলও বটে; কারণ পাঁচ বৎসরে পা দিবার পর এই সচল মনোহারী পুত্তলীটিকে বেটাছেলের বেশে সাজাইয়া জয়দেবের পদ মুখস্থ করাইয়া কাঁধে করিয়া সঙ্কীর্ত্তনে নাচিয়া বৃন্দাবনের সুখের অবধি ছিল না। বাপের আদরে সে ঘরের সর্ব্বস্ব চুরি করিয়া খাইত, পাড়ার ছেলের দলে মিশিয়া কপাটি খেলিত, এবং মাঝে মাঝে পিতা ও কন্যায় পরামর্শ করিয়া দূরগ্রামে যাত্রা শুনিতে সরিয়া পড়িত। জগদম্বা বকিয়া কাণ মলিয়া খিমচাইয়া তাহাকে বাগে আনিতে পারিতেন না। সে কি কম মজা! একে নিয়ম ভাঙ্গিবার সুখ, তাহার উপর বাবা সঙ্গী, আর সবার উপর ঐ সবুজ ধানের আলে আলে কখন বা গরুর গাড়ির পোয়াল গাদায় চড়িয়া ক্যাঁচর কোঁচর করিতে করিতে আম্রচ্ছায়ায় লুকান গ্রামগুলিকে খুঁজিয়া খুঁজিয়া ফিরা।

মেয়ে রাত্রে মৃৎপ্রদীপের আলোয় ঝুঁকিয়া পড়িয়া বাপের কাছে সংস্কৃত ও বাঙ্গলা শিখিত। তাহাও জগদম্বা ঠাকুরাণীর চক্ষুশূল। "হ্যাঁ গা, মেয়ে কি খোকার মুখে মাই দিতে দিতে মুন্সেফী করবে, না টোল খুলে ছেলে ঠেঙ্গাবে?"

দরিদ্র বৃন্দাবন না খাইয়া ছয় সাত বৎসরের মিতব্যয়ের ফলে নন্দ-কিশোরের স্বর্ণালঙ্কার গড়াইয়া দিয়াছিলেন। একদিন সন্ধ্যার সময় কণ্ঠা-পাঁজর জাগিয়া উঠা শীর্ণদেহ এক বেদে আসিয়া খেলায় মত্ত সুঁদির কাছে হাত পাতিয়া বলিল, "মা! ছেলেকে দুটি খেতে দে!" সুঁদি তখন

পাঁচ বছরেরটি। খেলা ছাড়িয়া সে একছুটে ভাঁড়ার ঘরে গিয়া হাঁড়িতে হাঁড়িতে হাত দিয়া দেখিল চাল ডাল কিছুই নাই। তখন সে আস্তে আস্তে ফিরিয়া আসিয়া তাহাকে বলিল, "মা গা ধুতে গেছে; চাল নেই গো; কাল এস, দেবখন। এখন হাত আজাড় নেই, কে হাটে যায়; এ ব্রেহৎ সংসারটার ঝক্কি কি কম গা!"

ভিখারী তখন দাঁত বাহির করিয়া ধুঁকিতেছে। "সোনা নেবে?" বলিয়া স্বঁদি ঠাকুরের অঙ্গ খালি করিয়া অঞ্জলী ভরিয়া আনিয়া সেই সব অলঙ্কার তাহার ছেঁড়া কাঁথায় ঢালিয়া দিল। বেদে হতভম্ব হইয়া একবার এদিক ওদিকে চাহিয়া ভোঁ দৌড় দিল। মেয়ের আকাশ ফাটান কান্নায় বৃন্দাবন ছুটিয়া আসিয়া দেখিলেন, জগদম্বা মেয়েটাকে গুম গুম করিয়া কিলাইতেছে। ভিখারীকে কিন্তু কেহ দেখে নাই, জগদম্বা দূর হইতে দেখিয়াছিল মেয়ে যেন এক ভিন্ন গাঁয়ের অচেনা বামুনকে কি দিতেছে; বাড়ী আসিয়া দেখে এই কাণ্ড! বৃন্দাবন কন্যাকে ক্রোড়ে লইয়া বলিলেন, "তুমি মেরো না গো, আমার মা সামান্যি নয়। নারায়ণ তার নিজের জিনিস জগল্লক্ষ্মীর হাত দিয়ে নিজেই নিয়েচেন গো। আমি যেমন গাধা, তাই বুঝিনি আমার সোণা জগৎপতির কাছে মাটি, বেশ করেছ ঠাকুর, খুব আক্কেল দিয়েছ।"

সুন্দরী যখন সাতে পা দিয়াছে তখন একদিন মসীদবেড়ে গ্রামে সাধক কৃষ্ণানন্দ ভারতীর আবির্ভাব হইল। কৃষ্ণ প্রেমমত্ত সে জ্যোতির্ম্ময় সৌম্যরূপ যে দেখিল সেই মজিল; গ্রামে জনতায় মাঠ ঘাট ভরিয়া কালো মাথার তরঙ্গ খেলিল। বৃন্দাবন কন্যার হাত ধরিয়া সম্মুখে আসিয়া প্রণাম করিতে না করিতে ভারতী সোৎসাহে বলিয়া উঠিলেন, "তুই এ মাগীকে কোথায় পেলি রে? এ যে অলখনাথের সেবাদাসী! আমি যে খুঁজে বেড়াচ্ছিলুম।"

বৃ। অলখনাথ কে, বাবা ?

ভা। দ্বারকেশ্বরের ঐ উঁচু পাড়ের মধ্যে লুপ্ত আছে রে, একদিন জাগবে। তার জীয়ন্ত বিগ্রহ সেই রাঙ্গা নেংটা যোগী রে।

বৃন্দাবন চমকিয়া উঠিলেন, এ ত তাঁহারই কন্যালাভের স্বপ্নবৃত্তান্ত! বৃন্দাবন শুনিলেন সে যোগী ভারতীর গুরু, মানস সরোবরে আছেন। ইহার পর তাঁহার মেয়ে স্ত্রী ঘরদুয়ার সব যেন কেমন বিরস তুচ্ছ হইয়া গেল, ছায়ার মত ভারতী ঠাকুরের সঙ্গ লইয়া ব্রাহ্মণ নবদ্বীপ যাত্রা করিলেন, সেখান হইতে তাঁহার নিকট তিলক কণ্ঠী লইয়া মথুরার পথ ধরিলেন। রামবসুও বৃন্দাবন অবধি তাঁহার সহিত ছিলেন, স্ত্রীর কথায় উদাসকণ্ঠে বৃন্দাবন বলিলেন, "তাদের নন্দকিশোর দেখবেন, আমাকে দিয়ে গৃহধর্ম্ম বুঝি আর হ'ল না।"

স্বামিশোকে অধীরা জগদম্বা রামের মুখে শুনিল বৃন্দাবন কন্যাকে সৎপাত্রস্থা করিয়া পত্নীকে তাঁহার অনুগমন করিতে বলিয়াছেন। কিন্তু মেয়েলোকের মনের গোড়া উপড়াইয়া তোলা কি সহজ! তাহারাই ত এ সংসারের শরণ। কি করি কি করি করিয়া অনেক কাল গেল। অনেক বিলাপ ও অশ্রুপাত করিয়া দুই চার খানি যে সোণার গহনা ছিল অগত্যা জগদম্বা তাহা বিক্রয় করিল। নলঘাটার গোপী বাঁড়ুয্যের পুত্রের সহিত সুঁদির বিবাহের পাকা দেখা হইয়া গেল। হিন্দু-সমাজে চিটা গুড় পাইলেই মাছি পড়ে।

আজ রাত্র বারটায় লগ্ন। রাম বসুর প্রশস্ত উঠানে সামিয়ানা খাটাইয়া বরযাত্রী বসিয়াছে। বৃন্দাবনের বৈবাহিক গোপী বাঁড়ুয্যে বেঁটে কালো খোঁচা খোঁচা গোঁফ, ভুঁড়ি ও টিকি সমেত যেন তরমুজটি। বর দেখিতে মন্দ নয়, তবে কিছু ট্যারা ও আরও দুইপক্ষ বর্ত্তমান; এক শত পঁয়ষট্টি টাকা কবলাইয়া এবারে তৃতীয় পক্ষে রাজী হইয়াছেন। চারিদিকে

হৈ হৈ, নহবতের সুখ-সঙ্গীত ও উত্তেজনা। আতর মাখিয়া সুন্দর রঙ্গীন কাপড় পরিয়া ফুলের মালা গলায় ছেলের দল ঘর বাহির ছুটাছুটি করিতেছে; বৃন্দাবনের কুঁড়ে ঘর আজ কুললক্ষ্মীদিগের আনন্দবাজার; সম্বরা দিবার ছ্যাঁক কল্‌কল্‌, কড়া-খুন্তির ঠন্‌ঠনানি আর খিল্‌খিল্‌ হাস্যে মুখরিত। কেবল কর্ম্মরতা জগদম্বা কন্যার আসন্ন বিরহে ম্লানমুখী।

সুঁদি চেলির কাপড়ের থোপটি হইয়া এক ঘরে একা পিঁড়ির উপর প্রতিমার মত কাঠ হইয়া বসিয়া আছে। সে ঘরের পিছনে কচুবন ও এঁদো পানাপুকুর। হঠাৎ চড় চড় করিয়া বাঁশের বেড়া কাটিয়া একটা হাত দেখা দিল। সুঁদি ভয়ে হিম হইয়া চেঁচাইয়া বাড়ী মাথায় করে আর কি, এমন সময়ে সে দেখিল বেড়ার ফাঁক দিয়া মাথা গলাইয়া হাসি হাসি মুখে রাধু তাহার দিকে কেমনতর ভাবে চাহিতেছে। সে হাতছানি দিয়া ডাকিতে সুঁদি এদিক ওদিক চাহিয়া উঠিয়া গেল, ফিস্‌ ফিস্‌ করিয়া তাড়াতাড়ি বলিল, "এ আবার কি? যাও, আমাকে যে উঠতে নেই।" রাধুর গণ্ড বহিয়া জল পড়িতেছে, সে হাতের এক ঘসায় তাহা মুছিয়া ফেলিয়া বলিল, "কাল ওরা তোকে নিয়ে যাবে!" সে সুন্দর মুখের নীরব কাতরতা দেখিয়া সুঁদিরও অশান্তিভরা বুকের মধ্যে কি একটা ঠেলিয়া উঠিতেছিল। কিন্তু দুঃখ অপেক্ষা ধরা পড়িবার ভয় অনেক বেশী, সে আবার ব্যস্তভাবে বলিল, "যাও যাও! দেখলে মা মারবে; আমি যে বিয়ের কনে, এখনও সম্প্রদান হয় নিক।" হঠাৎ বিনা বাক্যব্যয়ে রাধু মাথা বাহিরে গলাইয়া লইয়া সুঁদির হাত ধরিয়া হিড় হিড় করিয়া সেই ফাঁকের পথে টানিয়া বাহির করিল, চ্যাঁচাড়তে বাধিয়া মেয়েটার চেলির কাপড় ছিঁড়িয়া গেল, মুখ গাল হাত ছড়িয়া রক্ত-নদী বহিল। সুঁদির ভয়ে হাঁপ ধরিয়া বুক টিপ টিপ করিতেছিল, কিন্তু তাহার হাতে পায়ে ধরা মর্ম্মান্তিক কাকুতি মিনতি শোনে কে?

তাঁহাকে কাঁধে করিয়া রাধু অন্ধকারের মধ্যে ভোঁ দৌড় দিল। রাধুর গলার ফুলের মালা নিশার জমাট আঁধারের রাজ্যটিকে গন্ধে মত্ত করিয়া সুঁদির হাতে জড়াইয়া রহিল।

বিবাহের সময়ে সাত পাক খাওয়াইতে মন্ত্র পড়াইতে কন্যার খোঁজ পড়িলে দেখা গেল বধূ নাই, চ্যাচাড়ির খোঁচায় চেলির টুকরা বাধিয়া আছে, চারিদিকে কাদায় অনেক গুলা পায়ের ও আঁচড় পাঁচড়ের দাগ। একটা ডাকাত-পড়া রকমের রৈ রৈ কাণ্ড পড়িয়া গেল আর কি। লগ্ন উত্তীর্ণ হইবার পর যখন কন্যা পক্ষের মাথা হেঁট করিয়া গালি গালাজ দিয়া বরকে লইয়া বরযাত্র ভাঙ্গিয়া চলিয়া গিয়াছে, বাড়ীর মধ্যে মেয়ের দলে মড়াকান্না উঠিয়াছে, তখন অনেক রাত্রে লণ্ঠন হাতে আঁদাড়ে পাঁদাড়ে খুঁজিতে খুঁজিতে মশান চরের ভাঙ্গা মন্দিরে বধূকে পাওয়া গেল। রাম বসুর কোলে চড়িয়া সুঁদি বাটী আসিয়া বাঘিনী মায়ের খর্পরে পড়িয়া মুহুর্মুহু খিমচি ও কাণমলা খাইয়া কাঁদিয়া ফেলিল, গেঙ্গাইয়া গেঙ্গাইয়া বলিল, "রাধুদা' যে হিড় হিড় করে টেনে নে গেল য়্যা য়্যা য়্যাঁ, আমি কি করবো য়্যা য়্যা য়্যাঁ—।"

রাত্র পোহাইতে আর ঘণ্টা খানেক বাকী, এ দিকে ব্রাহ্মণের জাতি যায়। রামবসু উপু হইয়া হুঁকা হাতে অনুপস্থিত কুলপ্রদীপ পুত্রের উপর রাগিয়া অজস্র গালি পাড়িতে ছিল, "কায়েতের কুলের চণ্ডাল, শূয়োর পাজি নচ্ছার গুয়োরব্যাটাকে একবার পেলে হয়, খড়ম পিটিয়ে শর্ষে ফুল দেখিয়ে দিই," - ইত্যাদি। সে দিন কার্য্যগতিকে গোপীনাথ পুরের জগন্নাথ ভাদুড়ির বৃদ্ধ অশীতিপর পিতা শশি ভাদুড়ি রামবসুর বাটীতে ছিলেন। গ্রামের মাতব্বরেরা তাঁহার পায়ে গিয়া হুমড়ি খাইয়া পড়িলেন, তাঁহাকে ব্রাহ্মণের জাতি রাখিতে হইবে। বড় কুলীন শশি বাবুদের হাতচিঠা বহি দেখিলে তাঁহার এক শ' তেরটি

সংসারের ঠিকানা ও ইতিবৃত্ত পাওয়া যায়। বৎসরের ছয় মাস মাথায় পুঁটুলি, হাতে লাঠি, কাঁধে গামছা, পায়ে এক হাঁটু ধুলা লইয়া ইনি বর্দ্ধমান হুগলি মেদিনীপুরের এক শ' তেরটি শ্বশুরালয়ে দর্শন দিয়া পা ধোয়ানী নমস্কারী ভোজন দক্ষিণা ইত্যাদি আদায় করিয়া বৃদ্ধ হইয়াছেন। এখন এই কুব্জদেহ প্রায় কুকুরকুণ্ডলী বৃদ্ধ গণিয়া এক শত তের টাকা পণ লইয়া সংসার-ত্যাগী বৃন্দাবনের কুল রাখিলেন।

কয়েক দিন পরে ঘাটে জল আনিতে গিয়া সুঁদি দেখিল রাধু হাঁটু জলে নামিয়া দুই হাতে জল লইয়া কপালে মুখে দিতেছে। সে কয়েক দিন নিরুদ্দেশ থাকিবার পর আজ বাটী ফিরিয়া পিতার হাতে প্রাণান্তক প্রহার খাইয়াছে। সুঁদিকে দেখিয়া অমন সুন্দর মুখখানা মুখভঙ্গীতে কদাকার করিয়া সে বলিল, "নাম করে দিয়েচিস্ বটে? শূয়োর পাজী গাধা! বাবা মেরে ভূত ভাগিয়ে দিলে যে।" সুঁদি দেখিল সত্যই রাধুর কপাল কাটিয়া রক্ত পড়িতেছে, মুখ ফুলিয়া ঢোল হইয়াছে, পিঠে স্থানে স্থানে নীল কাল-শিরা পড়িয়াছে। নিজের অনুতপ্তভাব লুকাইয়া সে ঠোঁট ফুলাইয়া বলিল, "তা' কি করবো, তুমি ধরে নে গেলে কেন? আমি বুঝি খিমচি কানমলা খাইনি—যঁ্যা।"

রাধু। যা' দূর হ'য়ে যা'!

সুঁদি ভিজা আঁচলে রাধুর কপাল ধুইয়া দিতে লাগিল, শেষে বলিল, "আমি কলসিটা রেখে আসিগে।" এত বড় বেইমানী করিবার পর আজ সাধিয়া প্রস্তাব না করিলে চলিবে কেন? ছুটাছুটি বাটী গিয়া ঠাকুর-ঘরের দাওয়ায় দুম করিয়া কলসী রাখিয়া সে মাকে না বলিয়া কহিয়া পলাইল। ঘাটে আসিয়া দেখিল রাধু পথ চাহিয়া বসিয়া আছে; তখন দুই জনে কোমর বাঁধিয়া হাত ধরাধরি করিয়া যাত্রা করিল।

অবুঝ জগদম্বা জামাই দেখিয়া যে কান্না কাঁদিয়াছিল, শশি ঠাকুর

তিন মাসের পর ধনুষ্টঙ্কার রোগে শিশু ফুঁকিলে আট বৎসরের কন্যার সীমন্তের সিন্দূর মুছিয়া মেয়েকে বুকে করিয়া হতভাগিনীকে আবার সেই বুক-ভাঙ্গা কান্নাই কাঁদিতে হইল। এত দিনে জগদম্বা বুঝিল কেন মহা-প্রাণ স্বামী সংসার ছাড়িয়া অরণ্য আশ্রয় করিয়াছেন। হিন্দুর সমাজ যে হিন্দুই শ্মশান করিয়াছে। মা ও মেয়ের দু'জনেরই সংসার সুখের সাধ তো এক রকম চুকিল; তাই জগদম্বা একদিন গ্রামবাসীদিগের নিকট গললগ্নবাসে বিদায় লইয়া গৃহদেবতা নন্দকিশোরকে সঙ্গের সাথী করিয়া মেয়ের হাত ধরিয়া তীর্থযাত্রী দলের সহিত মথুরার পথ ধরিল।

রাধু সে কয়দিন বাটী ছিল না। ফিরিয়া এই সংবাদ শুনিয়া সে একেবারে বসিয়া পড়িল, যে পিতাকে সে যমের মত ভয় করিত তাঁহার বৈ কথানায় হঠাৎ ঢুকিয়া পড়িয়া তামাকু-সেবন-পরায়ণ রাম বসুকে ধরা ধরা গলায় জিজ্ঞাসা করিল, "বাবা! এরা কোথায় গেল গো?" রাম বসুরও কথা বলিবার সাধ্য ছিল না, তিনি ইঙ্গিতে পুত্রকে কাছে ডাকিয়া বসাইয়া নিঃশব্দে তাহার পিঠে হাত বুলাইয়া দিতে লাগিলেন। রাধু বসিয়া মনের সুখে কাঁদিল। পিতা পুত্রে এরূপ মিলন বহুকাল হয় নাই, ভাব এমনি জিনিস যে কোথায়ও ঝড়ের মত উঠিয়া বিষ ঢালিয়া দিয়া চিরদিনের প্রণয়-সম্বন্ধ ভাঙ্গিয়া দিয়া যায়, আবার কোন স্থানে এমনি করিয়া হঠাৎ নিঃশব্দে সে ফাটা ভরিয়া দিয়া যায় যে কাহার সাধ্য বলিবে কোথায় ভাঙ্গিয়াছিল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

রঙিন নেশা—কলহ

তাহার পর দশ বৎসর পরের কথা। কলিকাতায় পাঠ সমাপন করিয়া মতি ও রাধু গ্রামে ফিরিয়াছে। রাধিকাচরণের সহিত মা দুষ্ট-সরস্বতীর বড় স্নেহ. তাই কলেজে রাষ্টিকেট হইয়া নাম কাটিয়া সেই আগে মসীদবেড়েয় আসিয়া উদয় হয়। সেই অবধি জমিদার গোকুল মিত্র ও নায়েব গুড়গুড়ে ভটচাযের সহিত তাহার দা-কুমড়া সম্বন্ধ; কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এ-ক্ষেত্রে চৌদ্দটি তালুকের প্রবল-প্রতাপ জমিদার ও নায়েবই কুমড়া, আর মাত্র দেড়শ' কি দুইশ' বিঘা ধেনো আবাদী জমির মালিক ডানপিটে রেধো সর্দ্দার কিনা দা! আজও কি তবে এত জীবন্মৃত দশায়ও এ মাটি বীরভোগ্যা !!

বহু পূর্ব্বে সেই হেয়ার ও ডিরোজিওর আমলে পাশ্চাত্য সভ্যতার উত্তাল তরঙ্গ বঙ্গসমাজের মাথার উপর দিয়া বহিয়া গিয়াছিল। ভুদেব ও চন্দ্রনাথ বাবুর লেখায়, ভারত-মেলায়, ও হেমচন্দ্রের মোহন বাঁশের বাঁশীর ফুঁকে সে ভাব-সম্মোহনের প্রতিক্রিয়ারও সুর বাজিয়া চুকিয়াছিল। কিন্তু বাঙ্গালীর পা তখনও দুই নৌকায়, পাশ্চাত্যের সে রাজস চেতনা বাঙ্গালীর ভাবে প্রেরণায় মিশিয়া নবযুগের সজাগ বাঙ্গালী গড়িতে এতকাল লাগিবে বলিয়া তখনও এদেশের মন সংশয়-দোলায় দুলিতেছে। মৃতকল্পে শক্তি সঞ্চার করিতে বিষ অমৃতের অধিক ফলদায়ী, সন্দেহ নাই; কিন্তু তখন জাতি-দেহ ছিল নিতান্ত

নির্বীর্য্য আর ঔষধ ছিল বড় তীব্র ও সতেজ ; তাই সমাজ দেহে নানা বিকার নানা অস্বাভাবিক উত্তেজনার সৃষ্টি করিতেছিল।

মতি ও রাধিকা এই ভুক্ত-বিষ বাঙ্গলার সন্তান। বিষ পরিপাক করিয়া বঙ্গ তখনও নীলকণ্ঠের পূর্ণশিবত্ব লাভ করে নাই, তাই তাহারাও জ্ঞানে অজ্ঞানে আলোয় আঁধারে নিজেকে চিনিয়াও চিনিতেছিল না। মতি হেয়ার স্কুলের জুনিয়ার-শিপ পাশ ; রাধু পড়িয়াছে এক ক্লাস নীচে অব্ধি ; মাষ্টারকে ধরিয়া উত্তম মধ্যম দিবার জন্য রাধিকার নাম কাটিয়া দেওয়া হয়। যৌবনের উচ্চাশার সোণালী স্বপ্নঘোরে উভয়েরই আকাশ রঙিন, কারণ ছুইজনেই আইডিয়ালিজমের গেঁজেল। মতি পাশ্চাত্যের মত ভোগ ও উদ্দাম কর্ম্মস্পৃহার বড় অনুরাগী—সে একটা ভাবের ক্ষেপা মহিষ। একবার মাথায় যে ভাব ঢোকে, তাহা লইয়া গোঁয়ারের মত ছুনিয়াশুদ্ধ লোককে গুঁতাইয়া ফিরে ; এই উদীয়মান কালাপাহাড়টী ভাবে, ধর্ম্মে সমাজে জাতীয়তায় যে সব পুরাতন পাথরের দেবতা এতকাল বসিয়া ভোগ পাইতেছে, তাহাদের নাক কান হাত পা কোন উপায়ে নিঃশেষে কাটিয়া অঙ্গচ্ছেদ করিয়া দিতে পারিলেই এ পূজা উঠিয়া যাইবে, সাতপুকুর মাটি কাটিয়া পাঁক ছেঁচিয়া দিতে পারিলেই পশ্চিমের কালো মেঘ আসিয়া বর্ষিয়া আপনি এ দীঘী আবার টল্‌টলে জলে ভরিয়া দিবে।

তর্কালঙ্কার ঠাকুরের দেখাদেখি রাধু টিকি রাখে, মাস্তুলের মত প্রকাণ্ড নাকের উপর ও ললাটে চন্দনের তিলক কাটে ; পুরাতনের প্রাণ আদর্শ-চেতনা যথা সাধ্য বজায় রাখিয়া তাহারই ম্লান নিস্পন্দ দেহে নূতন বসন্ত-হিল্লোল আনিতে চাহে। গ্রামে আসিয়া অবধি মতির সহিত জুটিয়াছিল বুড়া পঞ্চানন তর্কালঙ্কার ; পাঁচু তর্কালঙ্কার ভুদেববাবুর ভক্ত, মতি রামমোহনের গোঁড়া। তবু ছু'জনের বড় ভাব ; মতির ওলটপালট-করা পাগলা ভাবগুলার

টানে পাঁচুর স্থিরবুদ্ধি ভাসিয়া যায়, আর তাঁহার চিন্তার গম্ভীরত্বে মনে মনে মতি মুগ্ধ। তাঁহার গুরুগম্ভীর চালের জন্য পঞ্চানন এ গ্রামের বালক বৃদ্ধ সকলের ঠাকুরদা', মতি গ্রামে আসিয়া অবধি সে গোঁড়া ব্রাহ্মণ-কুলে লঙ্কাদাহী বিভীষণ-স্বরূপ হইয়াছে। মতির ডাইনামাইটের মত অগ্নিকাণ্ডকারী বিস্ফোরক ভাবগুলা যে এতদিনে নিঃশব্দে তাহার ধাতে কি অবধি কড়া আফিমের কাজ করিয়াছিল, তাহা পাঁচু নিজেই বুঝিতে পারে নাই। নীরো যেমন রোম নগরীতে আগুন লাগাইয়া উচ্চ মঞ্চে বসিয়া তাহার প্রলয়াত্মক লোলরক্ত শোভা দেখিয়াছিল, পাঁচুর বড় সাধ তেমনি করিয়া একদিন হিন্দুসমাজের জীর্ণ খোড়ো চালে আগুন ধরাইয়া দিয়া একটা পেল্লায় রকম মজা দেখিবে। বসিয়া বসিয়া সে মতির হাতমুখনাড়া চক্ষুকপালে-তোলা বক্তৃতা শুনিত, আর নেশায় বুঁদ হইয়া চরকী-বাজীর মত ঘুরিয়া ঘুরিয়া ছেলে ক্ষেপাইত।

এইরূপ গোঁয়ার্ত্তামীর জন্য কলেজে পড়িবার সময়ে মতি অনেকবার বিপন্ন ও লাঞ্ছিত হইয়াছে। তখন বিধবা-বিবাহ দেওয়া একটা প্রাণসঙ্কট ব্যাপার ছিল। শাশুড়ী ননদিনীর দ্বারা নির্য্যাতিতা সাহাদের বাটীর এক বিধবাকে পরিবারের অজ্ঞাতে বিবাহ দিতে গিয়া কলিকাতায় মতির কেবল জেল হইতে বাকি থাকে, কালিঘাটে জুতা লইয়া প্রবেশ করায় পাণ্ডাদের ধনঞ্জয়ে তাহাকে মাসাবধি শয্যাশায়ী থাকিতে হয় এবং পতিতোদ্ধার করিতে গিয়া এক বেশ্যার বাড়ীতে মতির সর্ব্বস্ব কাড়িয়া লইয়া দুষ্ট লোকে তাহাকে একবস্ত্রে রাস্তায় বাহির করিয়া দেয়। কলিকাতার গোঁড়ার সমাজে তাহার নাম ছিল "পাষণ্ডী মিত্তির।"

এ বিষয় আশয় জমিদারী সব জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা হরিহর মিত্রের স্বোপার্জ্জিত, মতির কাকা গোকুল ইহার পাঁচ আনির অংশীদার। কৃতবিদ্য হইয়া ভ্রাতুষ্পুত্র বাটী আসিলে গোকুল প্রথম প্রথম ভাবিয়াছিলেন, "যাক্,

এতদিনে বুঝি ভাঙ্গা সংসার জোড়া লাগিল। এখন দেখিয়া শুনিয়া মতির একটি লক্ষ্মীশ্রী বউ আনিলেই এই বনিয়াদী বংশ বজায় থাকে।" কিন্তু ভ্রাতুষ্পুত্রের মতি গতি দেখিয়া শীঘ্রই নিরীহ গোকুলকে প্রমাদ গণিতে হইল। সর্ব্বনাশ! এ যে হিন্দুধর্ম্ম রসাতলে দিবে!! তাহার পর কাকা ও ভাইপোর নিত্য কলহ, অর্থাৎ মতির রাসভকণ্ঠে বক্তৃতা ও তাড়না এবং সহজে ভীত নির্ব্বিবাদ গোকুলের চিঁচিঁ করিয়া প্রতিবাদ ও হাঁ-তা-এ-ও প্রভৃতি অশ্বস্তির রব। গোকুল মিত্রের উভয়-সঙ্কট, মতির সহিত কলহ হইলে একদিকে যেমন এ একান্নবর্ত্তী বিরাট পরিবার নষ্ট হয়, তাহার এই সব অনাসৃষ্টি কাণ্ডে অন্যদিকে আবার ইহপরকাল বুঝি যায়।

অগত্যা অনন্যোপায় হইয়া গোকুল রামতারণকে এ পাষণ্ডী-তারণে নিযুক্ত করিলেন। রামতারণের শরীর রুক্ষ, বর্ণ মলিন, একপাটি দীর্ঘ অপরিষ্কার দাঁত বাহির করা মুখ, মাথায় অর্দ্ধহস্ত পরিমিত শিখা। সে এখন নিত্যানন্দময়ীর পূজারী হইয়াছে; সমাজে ঘোট পাকাইবার একটি আঁদি এবং অত্যন্ত নিষ্ঠাবান হিন্দু। কিন্তু চাল কলার লোভ তাহাকে বায়ুস্কন্ধারূঢ় তৃণের মত কখনও ছোট তরফ আর কখন বড় তরফের বৈঠকখানায় লইয়া ফেলে; বুড়া গোলোক নাথ আর মতি তাহার শ্যাম আর কুল। আর এক কথায় চালকলা বিদায় দক্ষিণা তাহার শ্যাম এবং তিলক ফোঁটা স্নানাহ্নিক তাহার কুল। কুল যথাসাধ্য বজায় রাখিয়া তাহাকে শ্যামের সহিত পীরিত করিতে হয়।

বড় তরফের মতিগতি ফিরাইতে হইবে শুনিয়া রামতারণ লোমশ তৈলচিক্কণ আব্লুশ কাঠের মত কালো নগ্ন উদরটিতে হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিল, "এই কাজ! হেঃ, তার আর কি? ওরে আকাল, ডাক তো ছোট বাবুকে—"।

গোকুল মিত্র নিশ্চিন্ত মনে হুঁকা হাতে কাঁচা পাকা গোঁফে অনর্গল

ধূমোদ্‌গিরণ করিতে করিতে তাম্রকূট সেবা করিতেছিলেন, এ-কথায় লাফাইয়া উঠিয়া হাত তুলিয়া চিৎকার করিয়া বলিলেন, "এহেঁহেঁ, এখানে না, এখানে না ; বাবাজীর সঙ্গে কথাটা আলাদা—"

রাম। আপনার সামনেই হয়ে যাক না।

গো। আরে, কি মুস্কিল ; তোমায় তবে বল্লুম কি, ওকে আলাদা বুঝিয়ে স্থঝিয়ে—

ইতিমধ্যে বাড়ীর মধ্য হইতে মতির চটি জুতার ফটর ফটর শব্দ হইল। বাহিরে একঘর লোক ; সকলের হাতে হুঁকা ; সে জুতার শব্দে সকলের মুখ গম্ভীর ; চক্ষু পরস্পরকে এড়াইয়া অন্যত্র ন্যস্ত। জুতার শব্দ অন্যত্র চলিয়া গেল, ক্ষণেকের জন্য একটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়া গোকুল বলিলেন, "দেখ দেখি কাণ্ডকারখানাটা একবার! যত ইংরিজি পোড়ো চ্যাংড়া ইয়ং-বেঙ্গল জুটেছে। হেঃ, তোরা মনু পরাশরের বুঝিস্ কি বাপু ? হেঃ! ভটচাযের সঙ্গে খ্যাচামেচি মেচোহাটা লেগেই আছে, বলে কিনা প্রজাকে তাঁইশ করতে ঠেঙ্গাতে পারবে না। জমিদারী ইদিকে লাটে উঠুক! আর ঐ কার্ত্তিক বাড়ুয্যের বিধবা মেয়েকে ধরে বে দেবে, এ যে ঘোর কলির—এহুম্! এই যে বাবাজী, আজ শরীরটা ভাল, কেমন ?"

হঠাৎ মতি আসিয়া পড়িয়াছে! কর্ত্তাকে বিব্রত ভাবে ইতস্ততঃ করিতে দেখিয়া রাম নিজে আরম্ভ করিল, "কর্ত্তার সঙ্গে আপনার কথা হচ্ছিল। আমি বলছিলাম যে ছোট বাবু হলেন একাধারে স্থরপতি ইন্দ্র বরুণ দিক্‌পাল সবই ; "স্বদেশে পূজ্যন্তে রাজা "আর কিনা বিদ্বান সর্ব্বত্র পূজ্যন্তে। কুলে শীলে বিদ্যায় গুণে আহা—আহা—আহা! দেশ উজ্জ্বল হয়ে গেল, অযোধ্যারমণ মিহিরকুলাবতংশ রামচন্দ্র আর কি। এখন সমাজ এঁর গুণে এঁর পিতার অনাচার বিস্মৃত হতে—"

মতি। কাকু, আমায় ডেকেছিলেন ?

গো। হ্যাঁ বাবা, ডেকেছিলুম। এই—আর কিছু নয়—কি জান রাম পণ্ডিত বলছিল কার্য্যটা কিছুকাল—ওর নাম কি—এহুম্ স্থগিত রাখলে দোষ কি ? লোক সব অবুঝ, তোমাদের মত ম্লেচ্ছ সাহেবী শিক্ষা ত এখনও পায় নি।

মতি। স্থগিত আর কি করে হয়! কলকেতা অবধি নিমন্ত্রণ চিঠি গেছে, সব এসে পড়লো বলে। আর এত লজ্জাই বা কিসের ? কোন ঘোর মহাপাতক ত আর করা যাচ্ছে না।

রাম। সে কি, সে কি; মহাপাতক নয়! কর্ত্তা ত বলছিলেন এতে সমাজ রসা—আপনি বুদ্ধিতে সাক্ষাৎ বৃহস্প—

গো। আমি বল্লুম ? হেঃ দেখেছ দেখেছ! তোমরা সব শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত, তোমরা বল্লে, না, আমি বল্লুম !

মতি। বালবিধবার বিবাহ না দেওয়ায় পাপ আছে, দেওয়া ত মহা পুণ্যানুষ্ঠান। আর হিন্দু সমাজের পাপে এত অরুচিই বা হ'লো কবে থেকে। জগন্নাথ ভাতড়ির ঝাড় ত আর উজোড় হয়ে যায় নি; শ্রাদ্ধে বিয়েতে মাঙ্গলিক বাই খেমটা ত চলছে; তীর্থে মন্দিরে মুক্তি-বেচা শাস্ত্রব্যবসায়ীর দল পোষণ হচ্ছে; পতি দেবতার চিতেয় সতীর বুকে বাঁশ দে এই সিদিন অবধি দলতে সমাজ ছিল কি পর্য্যন্ত উৎসাহী হা হা হা, পাপে তোমাদের শেষটা অরুচি হ'লো !

গো। আহা হা চটো কেন ? ঝগড়া ঝাটিতে কাজ কি ? সমাজে যে টেকা দায় হ'লো, সেটা তো দেখতে হ'বে।

রাম। (চক্ষু রক্তবর্ণ করিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে) মসীদবেড়ের গঙ্গানারায়ণ ঠাকুর, চন্দনার নকড়ি তর্করত্ন, পাংশার কেবলরাম বিদ্যাবাগীশ আর এই আমাদের বিষ্ণুপুরের বরদা এঁরা যা বিধি ব্যবস্থা

দিচ্ছেন, সব মিথ্যে ! শাস্ত্র মিথ্যে !! ঠাকুর দেবতা চন্দ্র সূর্য্য মিথ্যে !!!

মতি। একশ' বার ; মানুষের মনুষ্যত্বই সত্য, আর তোমার পৈতে টিকি আর ঐ সব মরা সাপের খোলস সর্ব্বৈব মিথ্যে। (চিৎকার করিয়া) Down with this social lie !

রাম। (কর্ণে আঙ্গুল দিয়া) রাম রাম শ্রীবিষ্ণু ! শুনলেন একবার কথাটা ! পথেও হাগবে, চোখও রাঙ্গাবে। তুমি—যা' হোক বিদ্যায় বৃহস্পতি, জ্ঞানে শুকদেব,—

মতি। হরিমণি গয়লানীর জন্যে সমাজ তোমার জাত মারেনি, সে চরিত্র সত্ত্বেও তুমি নিত্যানন্দময়ীর পূজক ; আর একটা দুঃখী অবলা মেয়ের গতি করলে সমাজ আমায় জাতিচ্যুত করবে ত ?—

গো। এ হে হে—কোঁদল বাধালে যে। ওরে কে আছিস্, একবার বাড়ীর ভেতর খবর দেনা।

মতি। আমি জানি এ বিয়েতে বাগড়া দেবার জন্যে পাষণ্ডীর দল ঠ্যাঙ্গাড়ে জোটাচ্ছ। আমি ম্যাজিষ্ট্রেট ন্যাভারেণ সাহেবকে সে খবর দিয়ে রেখেছি, তোমাদের আমি পুলিশে দেব তবে আমার নাম—

রাম। শুনলেন ত সব আপনারা, আমার চৌদ্দপুরুষান্তও হ'ল ; তার পর হাতে হাতকড়ি পায়ে বেড়ি, যে হেতু আমি সাতপুরুষ ধরে এই সংসারে ঠাকুর সেবা—(দাঁড়াইয়া উঠিয়া পৈতা হস্তে অভিশাপ দিবার উদ্যোগ।)

গো। (দাঁড়াইয়া উঠিয়া কাছা গুঁজিতে গুঁজিতে) ওহে ও মতি, ও রাম ঠাকুর, তোমরা ক্ষেপলে নাকি ? ডাক্ না কেউ গিন্নিকে একবার। কি গেরো ! ব্রাহ্মণ সন্তানকে রাগালে হ্যা, সংসারে অকল্যাণ—

রাগে গস্ গস্ করিতে করিতে কণ্ঠরুদ্ধ অবস্থায় বার কতক উত্তেজিত

ভাবে হাত নাড়িয়া মতি বাড়ীর ভিতর চলিয়া গেল। গোকুল আর সকলের সহিত হুঁকা হস্তে বসিয়া পড়িয়া কাঁপিতে কাঁপিতে সহাস্যে বলিলেন, "ইস্! কি রাগ দেখেছ বাবাজীর! হাজার হোক জাত কেউটের বাচ্ছা,—দাদা ছিলেন সে এক সিংহ-রেশে লোক। বৰ্দ্ধমান রাজার সভা-পণ্ডিত বাঘা চাটুয্যে দাদার ধমকে কাছায় বাহ্যে করে ফেলতো। রাম! রাম! শ্রীবিষ্ণু! কি বিপদ!!

রাম। দেখুন দেখি কি রকম অপমানটা করলে!

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

নবীনে প্রবীণে।

সে দিন সভাস্থলে অপদস্থ হইয়াও রামতারণ অপ্রস্তুত হইল না। রাগ করিলে দুইটি কারণে তাহার দিন অচল হয়। প্রথমতঃ সেই পূর্ব্বের কথা– তাহাকে শ্যাম ও কুল দুই রাখিতে হয়; দরিদ্রের যাহা হইয়া থাকে, প্রাণ রাখিতেই তাহার প্রাণান্ত। আর দ্বিতীয়তঃ দরিদ্র হইলেও উপবীত-সম্বল হইলেও সে বর্ণের শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ, গোপীনাথপুর সমাজের পারত্রিক কল্যাণের দায়িত্বের বোঝা তাহারই মাথার উপর রহিয়াছে। মতি-রূপ মত্তহস্তী বুঝি তাহার মনুর কালের সাজান বাগান আজ তছনছ করিয়া দেয়। গোকুল তাহার পক্ষের লোক বটে, আবার ভ্রাতুষ্পুত্রের তাড়নায় তটস্থ এই সাথীটি কিন্তু বিপক্ষে টলিতেও ক্ষিপ্রকর্ম্মা। কাজেই সে পরদিন আর একবার এই মতিচ্ছন্ন মতির সুমতি আনিবার আশায় তাহার ঘরে উদয় হইল। তখন তাহার শিকারটি অনবধানে বসিয়া স্পেন্সারের শোসিয়লজি পড়িতেছে, এমন সময়ে যেন আব্লুসকাঠের বার্ণিস করা তৈলাক্ত সদ্যস্নাত বপুখানি দুলাইতে দুলাইতে গোঁফের আগায় চটচটে মিঠে হাসি লইয়া রামতারণ প্রবেশ করিল।

রাম। কি হে—হ্যাঃ হ্যাঃ হ্যাঃ, কি পড়া হচ্চে!

মতি। এই হার্বার্ট স্পেন্সার। দেখুন, ঠাকুর দেবতার পূজো ও-সব আমাদের সেই অসুভ্যদশার থেই, ভূত প্রেত পূজো থেকে বরাবর খোলস বদলাতে বদলাতে চলে আসছে। এই দেখুন, না কালী—

জিব-বার-করা পাঁটা-ছাগল-খেকো ন্যাংটা মিশকালো সাঁওতালনী মাগী আর কি। গণেশ দেখুন! তার কিনা হাতির স্থঁড়, শিব ভাঙ্ খায় হাড়গোড় পরে, তুম্বুরু বাজিয়ে সাপ নাচায়—গারো কুকি ফুকির ভূত-ঝাড়া রোজা আর কি। এ সব হচ্চে দি রেলিক্ অব এ বার্বারাস্ এজ্।"

অতিবিস্ময়ে নির্ব্বাক রামতারণের হুঁকার ভুড়ভুড়ি বহুক্ষণ হইল থামিয়া গিয়াছিল, চক্ষু গোল হইতে আরও গোলাকার, মুখ হাঁ হইতে আরও হাঁ হইয়া যাইতেছিল। এখন সেই ব্যাদিত-গহ্বর হইতে দুই একটা অস্ফুট আওয়াজ বাহির হইতেই মতির যুক্তির খেই ক্ষণিকের জন্য ছিঁড়িয়া গেল। চন্ করিয়া তাহার রক্ত মাথায় চড়িয়া গেল; এই সোজা কথাটায় বিস্ময়ের আছে কি? সে উত্তেজিত ভাবে বলিতে লাগিল, "সব ঠাকুর দেবতার সঙ্গে সঙ্গে হয় সাপ নয় ছুঁচো কি হাঙ্গর কি পেঁচা কিম্বা ষাঁড়—এই সব পশুপূজো আর কি। আপনাদের সমাজ আর ধর্ম্ম একটি আস্ত ভূতের বাথান। আর ওই লিঙ্গ আর যোনি—ও দি ক্রাইং শেম্ অব্ ইট্।"

রামতারণ হুঁকা ফেলিয়া দুই কাণে আঙ্গুল দিয়া বলিতে লাগিল, "দেবনিন্দা! রাম রাম শ্রীরামচন্দ্র!" ক্রুদ্ধ মতির চক্ষু কপালে চড়িল, টেবিলের উপর ধম্ করিয়া একটা বিরাট ঘুসি কসাইয়া সে চেঁচাইয়া উঠিল, "ঐতো, তোমরা পচে ভেটকে গেছো; অপধর্ম্মের গোলাম, সমাজের খামখেয়ালির গোলাম, আবার কুসংস্কারের গোলাম; এ জাতের আর আছে কি? এখন চারটি ভিজে ছোলা আর পরম নিশ্চিন্ত দাড়টিই সাত-কাহন, খোলা উধাও আকাশ দেখলে ভয়ে সুড় সুড় করে সেই পিঁজরেয় ঢুকে মনের বাঁধা বুলি কপচান আর কি।"

রাম কষ্টে গোটা কয়েক ঢোঁক গিলিল, কর্ত্তার আদেশ—ঝগড়া করা হইবে না। একবার দাড়িতে হাত বুলাইয়া কোঁচা তুলিয়া লইয়া

একটা প্রণয়ের কাষ্ট হাসি হাসিয়া বলিল, "এ—ও—কি জান, সনাতন হিন্দু ধর্ম্মের ভেতরকার গূঢ়—এ উম্—ওর নাম কি, 'অর্থ মুনী ঋষিরা বুঝতে হিমসিম হয়ে গেছিলেন, আমরা কোন্ ছার।"

ম। হেঃ! ঋষি কি হাতী ঘোড়া? সেই বিনাইটেড যুগ আর এই পাশ্চাত্য সভ্যতার আলোর দিন! যে বস্তু নেই তা খুজতে গে হিমসিম তো হতে হবেই, কালীর অ্যাত্তবড় জিবটার মানে কি বলুন দেখি? কাল যদি আপনার ঘোড়া-মুখো ছেলে হয়ে চিঁহিঁহিঁ চিঁহিঁহিঁ করতে থাকে তা'লেই সেই মনষ্ট্রসিটিকে আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যায় দেবতা করে পূজো করতে হবে নাকি?

অগত্যা আর একদিন রামতারণ বুড়া গঙ্গানারায়ণ পণ্ডিতকে ধরিয়া আনিয়া মতির বৈঠকখানায় হাজির করিল। আশা এই, যে, পণ্ডিত এই কালাপাহাড়টাকে সায়েস্তা করিয়া দিবেন। তখন সেখানে শ্বেত পাথরের রেকাবির উপর রসে টসটসে পাকা সীঁদূরে আমটির মত তর্কালঙ্কার ঠাকুরও আসীন। কথা হইতেছিল জাতি ভেদের।

কিছুক্ষণ আলাপ শুনিয়া নস্য লইতে লইতে গঙ্গানারায়ণ পণ্ডিত বাধা দিয়া কাশিয়া বলিলেন, "বাপু হে, তোমরা সব অর্ব্বাচীন বালক। এ সব বড় গভীর কথা। বর্ণভেদ কোথায় নাই? কোন না কোন মূর্ত্তিতে সকল সমাজে বর্ত্তমান, আর এই বর্ণভেদের উপরই সমাজের প্রাণ নির্ভর কচ্চে। বিষমতাই জীবন, সত্ত্ব রজঃ তমঃ বিষম হলেই সৃষ্টি; সমে যে লয়। তার ওপর এই সাত শ' বচ্ছর মুসলমান আক্রমণ ও অধীনতা সহ্য করে এ জাতটা টিঁকে আছে ঐ জাতের গণ্ডীটা ছিল বলে।"

ম। ও আপনার ভুল। এ রকম বিদ্‌ঘুটে জাত-ধর্ম্ম কোথায়ও নেই, বড় জোর বংশ-মর্য্যাদা আর ধনের জন্য কিছু সামান্য-ভেদ আছে।

রুস, ইংরাজ, ফ্রান্স, স্পেন, ইতালি কত বহির্জাতির আক্রমণ সহ্য করে তাদের সমাজে মিশিয়ে নিয়েও নষ্ট হয় নি, তার কারণ জাত-ধর্ম্ম নয়; তার কারণ রুস, ফ্রান্স, ইতালি বা ইংরাজের বিশিষ্ট সভ্যতা বা জাতীয় জীবনাদর্শ। আর্য্যের সঙ্গেই কি দ্রাবিড়াদি জাত মেশে নি? নিয়মের কয়েদ খানায় জাত গজায় না, মরে নির্জীব হয়ে আসে।

গঙ্গা। নিয়ম কোথায় নেই হে বাপু?

ম। (উত্তেজিত হইয়া) সে নিয়ম স্বভাবের স্বতঃস্ফূর্ত্ত ধারা, মানুষের গড়া বেড়ি হাতকড়ি শূল ফাঁসিকাঠ নয়। আগাছা ঘাস যত গজিয়েছে সব চষে দু' পর্দ্দা মাটি উল্টে দে' ওগুলো তা'তে পচালে তবে গে ভাল ফসল গজাবে। আগুনের হলকার মত তেজি মানুষ চাই। রামমোহন, বিদ্যাসাগর যে জগদ্দল পাথরটা একটু নেড়ে দে' অমর হয়ে গেলেন, সেই পাথরকে গড়িয়ে নে সাগরে ডুবিয়ে দেবার লোক চাই।

তর্কা। হা হা হা—ভায়া যা' বলেছ। সাক্ষাৎ বাসুদেব কিশোর গোপালরূপে এসে এই গিরিগোবর্দ্ধন হাতে তুলে ধরবেন তবে তো। তা', দেখ বাবা, হয়তো সেই নারায়ণ বুঝি এলেন—(হেঁড়ে বেসুরো গলায় তান ধরিয়া)

কালীয় দলন কাল নিরঞ্জন
গিরিগোবর্দ্ধনধারী রে;
নরদেহধর যোগী অগোচর
গোপিনীর চিতহারী রে।

মতি পায়চারী করিতে করিতে হঠাৎ তর্কালঙ্কারের নিকট থামিয়া তাঁহার কুমড়ার মত পেটটিতে আঙ্গুলের টোকা মারিতে মারিতে বলিল, "আপনার ও গোপী গয়লা ফয়লার কর্ম্ম নয়। চাবুক চাই চাবুক,

ঝাঁটা চাই ঝাঁটা, একেবারে, ব্রাইড্‌স্ পার্জ্ লাগিয়ে দিন। পর্দ্দা সিষ্টেম হলো তাতার তুর্কীর কাছে সাত শ' বচ্ছর গোলামী করার দাগ। যাদের বিশ্বাস, পুরুষের কাছে নিজের মা বোন স্ত্রী দাঁড়ালেই ভ্রষ্টা হয়ে যাবে, তাদের বিশ্বাসে শত ধিক্। যারা ঘরের লক্ষ্মীকে দোর দরজা দিয়ে সতী রাখতে চায়, অথচ বৈঠকখানায় বাইনাচাতে লজ্জাবোধ করে না, তারা হিন্দু নয় শাস্ত্র-ব্যবসায়ী, লুচ্চো-লুচ্চো-লুচ্চো।"

রামতারণ নিত্যানন্দময়ীর পূজারী, চাল কলার লোভ তাহাকে বায়ুস্কন্ধারূঢ় তৃণের মত কখন ছোট তরফ আর কখন বড় তরফের বৈঠকখানায় লইয়া ফেলে, বুড়া গোলকনাথ আর বিশ্বেশ্বর তাহার শ্যাম আর কুল। কুল যথাসাধ্য বজায় রাখিয়া তাহাকে শ্যামের সহিত পীরিত করিতে হয়। সে বলিল, "তারা তারা, শ্রীদুর্গা! শ্রীদুর্গা! এত বাড়াবাড়ি কি ভাল? ছোট বাবু মনু পরাশর মান না, তুমি চণ্ডালবৃত্তি আরম্ভ করলে আমরা দাঁড়াব কোথা?"

এতক্ষণ বিব্রত তর্কালঙ্কার মতির আঙ্গুলের খোঁচা ও টোকা ঘন ঘন খাইয়া পিছাইতে পিছাইতে তক্তাপোসের মাঝখানে চলিয়া গিয়াছিলেন। এখন রামতারণের পালা।

মতি। মনু পরাশরের সময়ে হাজার হাজার রাজায় ভরা মজলিসে এসে হিন্দুর মেয়ে স্বামী খুঁজে নিত। তখনকার মত সতী সাত পর্দ্দায় ঘিরেও তো তয়ের হ'লো না। এখন বামুন অর্থের লোভে গরীবের জাত মারে, টিকি তিলক রেখে ছুতমার্গ চালায়, পয়সা নিয়ে ধর্ম্ম বিক্রি করে, আর স্মৃতি পুরাণের ও আচারধর্ম্মের নামে গৃহস্থকে পুত্র কন্যা বিক্রয়ের ব্যবসা শেখায়। শাস্ত্র বড়, না জাতের কল্যাণ বড় বলুন দেখি?

তর্কা। বাপু হে, তোমরা সব ইয়ং বেঙ্গল, নূতন বাঙলার কর্ম্ম-

গঙ্গা ; কোন্ ভগীরথের শঙ্খনাদে নেমে এসেছ। এই বুড়ো ঐরাবৎ গুলোকে কুমড়ো-গড়ানে করে নে যেতে হবে। বাবা ! এরা কি সহজে যাবে ?

রাম। তা' বৈকি, তা' বৈকি। ব্রাহ্মণ এখন অধোগামী। তর্কালঙ্কার ঠাকুর তুমি বোঝ না, কেবল ষাঁড়ের মত চেঁচাও ; ইনি হলেন বিদ্বের মানোয়ারী জাহাজ, মিত্রকুলমার্ত্তণ্ড বিশেষ। হি হি হি ! কি বলেন গঙ্গানারায়ণ ঠাকুর ?

ইহার পর রামতারণ বড়-তরফে গিয়া সদরে থপাস করিয়া বসিয়া পড়িয়া বলিল, "না, এ ঝকমারি আমার দ্বারা হবে না। বামুন দেবতার নিন্দে শুনে শুনে পাপের বোঝা পাহাড় হয়ে উঠলো। গোল্লায় গেছে, খৃশ্চেন মেরে গেছে।"

গো। (তটস্থভাবে উঠিয়া বসিয়া) ঝগড়া ঝাঁটি করলে নাকি ?

মতি। আরে রামচন্দ্র ! তা' কেন কর্ত্তে যাব ? বলছি যে বুঝিয়ে পড়িয়ে নিয়ে ওর সঙ্গে মুখশোঁকা শুঁকি করা আমার বাবার সাধ্য নেই।

গো। (আশ্বস্থ হইয়া) এই ? আমি বলি কি হ'ল ? তার আর কি ? ঝগড়া কোঁদল না হলেই হ'ল ? বোঝাবার সে আমি বুঝিয়ে নবখন্। হা হা হা—তোমাদের কাঁচা বুদ্ধি, আমরা কি জান বাবাজী সংসার ধর্ম্ম করে পেকে ঝুনো হয়ে গেছি। তোমাদের কাছে ও ফড় ফড় করে, তা বলে আমার সাম্‌নে কি বাবাজী মুখ খুলতে পারে ? একবার কাশীর আদিনাথ পণ্ডিত এয়েছিল, সে এক পেল্লায় তর্কসিদ্ধ পুরুষ। আমি পণ্ডিতও নই আর স্মৃতিচক্ষু ন্যায়বাগিশও নই, মুখ্যু সুক্ষু মানুষ ; কিন্তু—"

রাম। হরিহর মিত্তির কি একটা কম লোক ছিলেন, তিনি মরেচেন না একটা ইন্দ্রপাৎ হয়েচে। এই কত্তাকেই দেখুন না ;

দারোগা বাবু, এখন দেখচেন নিতান্ত শান্ত শিষ্ট ভাল মানুষ ভিজে বেড়ালটি ; কিন্তু এখনি একটা অন্যায় অধর্ম্ম দেখলে এঁর দাপটে, বুঝলেন কি না—হে হে হে। (ভুড়ুক ভুড়ুক ভুড়ুক।)

গো। হা হা হা।

কৈলাশ। (রামতারণের প্রতি) কিছু ঠেঙ্গাঠেঙ্গি বাধিও না হে, আমাদের সাহেব বড় কড়া লোক।

রাম। দেখুন দেখি সিদিনকে কি রকম অপমানটাই না কল্লে! আমাকে এখানকার গুখুরীর চাকরী ছেড়ে দিতে হবে দেখচি।

গো। আরে ছ্যাঃ। ওর কথা আবার গায়ে মাখে! তুমিও ছেলে মানুষ হলে হ্যা? ওর সঙ্গে পারবে কেন? সবাই তো আর খনেদী বংশের তেজ বীর্য্য পায় না।

রাম। অপমান তো কচ্ছেই, প্রতি নিয়ত কচ্চে। আপনাকে সব কথা বলিনে, বল্লে কথা পেটে রাখতে পারেন না, আর শুনে ঐ বাঁদর ধ্যাতাং ধেই ধ্যাতাং ধেই করে নাচতে থাকে।

গো। হেঃ! আমি কাকে বলতে যাব? এই চাঁপার গর্ভধারিণীর কাছে এক আধটুকু যা বলি ; এত বিষয় আশয় চালালুম আর অমনি খেলো মুখ হল্‌সা লোকের মত ঢাক পিটিয়ে বেড়াব? হিঃ। ভাল লোক তুমি যা' হোক্। তামাকটা গেল যে—শ্রীদুর্গে শ্রীদুর্গে! কি বিপদ!

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

কাম ও প্রেম।

অতঃপর রামতারণ ও গুড়গুড়ের দল পদ্মলোচনের দাওয়ায় তামাকু পোড়াইয়া স্থির করিল, মারামারিটা আর না বাধাইয়া বিবাহের রাত্রে কন্যা চুরি করিবে, মসীদবেড়েয় গিয়া কার্ত্তিক দত্তের খোড়ো চালায় আগুন লাগাইয়া দিবে। একদল গিয়া কার্ত্তিকচন্দ্রকে ধরপাকড় করিয়া ধমক চমক করিতে সে কুণ্ঠিত হইয়া বলিল, "কি করি ভায়া? আমার বা গিন্নির কি এতে মত আছে যে আমাকে গ্রেলোচ্চ? কি জান, হরিহর আর জমিদার-গিন্নী সৌদামিনীর অন্নেই আমরা গে মানুষ। মেয়েটা ছেলেবেলা থেকে একরকম ঐ সংসারেই আছে। তাই 'না' বলা বড় শক্ত। আমার অবস্থা আজই যেন একটু সুধরেছে, তা' বলে সেই দুঃখের দিনে ওরাই তো এসে বুক দে পড়ে অপমৃত্যু থেকে বাঁচালে। তবে তোমরা পাঁচ জন আছ, একটা বাগড়া ঘটিয়ে দাও, আমারও মুখ রক্ষে হবে, আর তোমাদেরও ঘোঁট বজায় থাকবে।"

জয়নারায়ণ পণ্ডিত চক্ষু পাকাইয়া দাঁত খিঁচাইয়া বলিলেন, "এটা একটা ঘোঁট হ'লো? সংকায়স্থের কুলে জন্ম, শাস্ত্র জান না?" উত্যক্ত হইয়া কার্ত্তিক চটিয়া গেল, ভুঁড়ি দুলাইয়া হাত ঘুরাইয়া উত্তর করিল, "তা' আর জানিনে, ভায়া? তবে ছা পো নিয়ে উপোস করে যখন কণ্ঠাগত প্রাণ হয়েছিলুম, তখন তোমাদের সামনে পড়ে দাপিয়ে যে গো-বধ হচ্ছিল, সে পাপের কথাটা তো কেউ একবার ভাব নি। ভাগ্গিস গোপীনাথপুরের হরিহর ছেল, তাই আজও ছা পো নিয়ে সশরীরে

বর্ত্তমান আছি। শাস্তর তো বেশ কথা, এর আর কি? তোমরা যা' হোক করে সম্বন্ধটা ভেঙ্গে দাও না। আমি নিজে এ চশমখোরীটা করি কি করে বল দেখি।"

জয়। মনুতে কি বলচে দেখ গে; মনুস্মৃতির ওপর আবার কোন্ স্মৃতি? পরাশরের শ্লোক বোঝে কোন্ শালা?

রাম। অনেক কাঠ খড় পুড়িয়ে তবে গে পণ্ডিত হয়। বিদ্যাসাগর পণ্ডিত! ও শকুনি মরে বামুন হয়েছে, ওর বইএর বাগ্দানের অধ্যায়টাই একবার পড়ে দেখ না। তারা তারা তুমিই মহামায়া! যে দিন কুসঙ্গে পড়ে শশীবিদ্যারত্ন কলকেতায় প্রথম এ কুকাজ কল্লে সেই দিন গঙ্গা আধ মাইল সরে গে পাঁক পড়ে গেছিল। হেঁ হেঁ বাবা! চালাকী? মা গঙ্গা হচ্চেন জাগ্রৎ দেবতা।

তিলকণ্ঠীধারী নফর গোঁসাই দাড়াইয়া উৎকর্ণ হইয়া বচসা শুনিতেছিল, সে জোড়হাতে বলিল, "বাবা ঠাকুর! আপনি সমাজের মাথা হয়ে এই নরকের পথ দেখাবে, তবে আমরা শুদ্দূর শালারা তো দৈবাৎ গোল্লায় যাব। একবার প্রণিধান করে দেখ না আপনি, সকলে যে সন্দর্ভ কচ্চেন সেই তো শাস্তর। দেখ ভুট্টিকাব্যে কি বলচে; আর কাশিপঞ্চাধ্যায় রয়েচে, ঐ কি বলে নারদপঞ্চপাত্র যোগমাষষ্ঠী রয়েচে, এ সব তো মানতে হবে।

ইহার পর কার্ত্তিক তো একেবারে অধোবদন! এ আসর ভাঙ্গিলে এখানকার তামাকু নিঃশেষ করিয়া নফর গোঁসাই খেয়া পার হইয়া রাধু বোসের বহির্বাটীতে গিয়া দেখা দিল। শম্ভু ঘোষ মারা যাইবার পর হইতে মসীদবেড়ের আর গোপীনাথপুরের ছেলের পাল নফরকেই "গঙ্গা ফড়িং" খেতাব দান করিয়াছে, কারণ সেও পোড়া শালকাঠের মত কালো ও সিড়িঙ্গে ঢ্যাঙ্গা।

নফ। এই যে দা'ঠাকুর, তামাক খাচ্চ যে! হি হি হেঃ।

রাধু। বোস বোস; কোত্থেকে?

নফর। জামাইবাবুদের ওখান থেকে। (ঝুঁকিয়া নিম্নস্বরে) একটা দক্ষিষজ্ঞি লাশ হবে গো, দেখে লিও তখন হয় কি না হয়।

রাধু। কি রকম, কি রকম?

নফর। বুধুই মোড়লের তাইদগিররা পাকা বাঁশে তেল ডোলচে। হিহি—কল্লে—চুরি, হি হি হি।

রাধুর প্রদত্ত হুঁকা লইয়া নফর দুই গোঁপ হাতের ঘসায় সই করিয়া লইয়া টানিতে লাগিল। রাধু বড় সুদর্শন। সেই গৌরকান্তি দস্যি বালক তপ্তকাঞ্চন বর্ণের দশাসই পুরুষে পরিণত হইয়াছে। রাধুর জীবনের শৈশবের দু'টা কথা এই অবসরে বলিয়া লই। বাল্য-বন্ধু সুঁদিকে হারাইয়া রাধু তাহার সই ইন্দিরাকে নিজের উজিরের শূন্যপদে ভর্ত্তি করিয়া লইবার চেষ্টা করিয়াছিল। কিন্তু ইন্দিরার সে অসমসাহস সে বেপরোয়া ভাব কৈ? সে মায়ের ভয়ে সদাই তটস্থ; রাধুকে দেখিলেই তাহার মন রাখিবার জন্য ফিক করিয়া হাসিয়া ফেলে, গাছে চড়িবার নামে টলিয়া টলিয়া হাসে, মার ধর করিলে তখনই প্যাঁ য়্যাঁ য়্যাঁ করিয়া কাঁদিয়া অনর্থ বাধায়। অগত্যা বিরক্ত হইয়া রাধু তাহাকে ত্যাগ করিল। এমন ফচকে প্যান্‌প্যানে লোক লইয়া কোন কাজ চলে? তাহার পর পিতার মৃত্যুর পরে বিষয় পাইয়া রাধু যখন পুরাপুরী বকিয়া গিয়াছে, তখন হঠাৎ একদিন নদীর ঘাটে ইন্দিরাকে বালির শিব গড়িয়া পূজা করিতে দেখিয়া নারীযৌবনলুব্ধ রাধুর চক্ষু এক তীব্র মধুর নেশার সুখে ভরিয়া উঠিল। এই ইন্দি! বাহ! কি রূপ, কি ললিত ক্ষুদ্র অঙ্গযষ্টি!! সেই দিন হইতে দুষ্টগ্রহ শনির মত রাধু তাহার পিছু লাগিল। ইন্দিরা তাহার বহু পূর্ব্বে বিধবা হইয়াছে; রাধু যখন তাহাকে

সুনজরে দেখিল, তখন তাহার বয়স ষোল, ছোট্ট দেহখানি, ছোট্ট ছোট্ট হাত পা—যেন কাঁচের পুতুলটি। ভরা রূপের হাট, কালো চক্ষে বড় টান। .প্রথম দিন সন্ধ্যায় নির্জ্জন ঘাটে রাধুর হাতে পাকড়াও হইয়া ইন্দি অধোমুখে স্তব্ধ ভয়ে দাড়াইয়া পায়ের আঙ্গুলে মাটি খুঁড়িল, তাহার কাণের মধ্যে রক্ত ঝাঁ ঝাঁ করিতেছিল, রাধুর কথা কাণের দ্বারে পঁহুছিল, মাত্র, ভয়ব্যস্ত মন তাহার বিন্দুবিসর্গও বুঝিল না। ইহার পর হইতে নিত্যই সে দিন থাকিতে থাকিতে ঘাটের কাজ সারিয়া পলাইত। তাহার পর আবার যে দিন দেখা, সে দিন রাধুর মুখে মদের গন্ধ ; চোখ লাল, সংযমের বাধ একেবারে ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। সে দিন হইতে ইন্দিরা আর ঘাটে আসিত না, তাহার মা জল লইয়া যাইত। সেই হইতে মাতাল রাঁধু এই ধিকি ধিকি কামনার আগুন বুকে ধরিয়া অনেক পঙ্কে ডুবিয়াছে, কিন্তু আশার তাপ মিটে নাই। সে ভোগরসের অন্ধ মাছি, বুঝিত না যে এ পিপাসা থাকাও দুঃখ, মেটাও ততোধিক দুঃখ,—এক পক্ষে দাহ অপরপক্ষে অবসাদের ক্লান্তি।

নফর গোঁসাইএর মুখে মেয়ে কাড়ার কথাটা রটিয়া যাওয়ায় বিবাহের তারিখ লগ্ন গোপন রাখা হইয়াছিল। গ্রামে প্রথমে রটিল যে ইংরাজি ব্যাণ্ড লইয়া বরযাত্র বাবুর দল কলিকাতা হইতে আসিতেছে। তাহার পর মথুরার দলের হৃৎকম্প ও পণ্ডিত মহলের আতঙ্ক উৎপাদন করিয়া জনরব উঠিল যে কলিকাতা হইতে গোরার দল আসিতেছে,—পুলিশ লইয়া আরামবাগের ম্যাজিষ্ট্রেট স্যাভারেন সাহেবও নাকি নিমন্ত্রিত। বিপক্ষ দল মাথায় হাত দিয়া বসিয়া ভেবাচেকা খাইয়া নীরবে তামাকু ধ্বংস করিতে লাগিল।

এ গাঁয়ে মেয়ে মহলে ইন্দিরার অনেক নাম, যথা—দেখন-হাসি, ধিঙ্গিপদ, হৈ হৈ, পেত্নি ইত্যাদি। তাহার হাস্য রসিকতার জ্বালায় সকলেই

অস্থির ছিল ; অথচ দিনান্তে একবার মেয়েটার দেখা না পাইলেও সবার মন পুড়িত। লবঙ্গ ঘাটের ফেরত একবার উঠানে দেখা দিয়া বলিত, "ও ইন্দি, মলি নাকি ? আর যে চুলের টিকিটি দেখবার জো নেই লা।" মিত্র গৃহিণী দাসী পাঠাইয়া সংবাদ লইতেন, ইন্দির হইল কি ; দত্তদের বাড়ীর নূতন বৌ দীর্ঘ ঘোমটায় জড়সড় হইয়া আনাচে কানাচে হইতে দু' দশ বার হাতছানি দিয়া না ডাকিয়া পারিত না। ইন্দি চেঁচাইয়া বলিত, "কেন লা', আমি কি তোর ভাতার না নাগর যে কেরমাগত লুকিয়ে ডাকচিস্ ?" বউ লজ্জায় পলাইত। এমন মুখরা রঙ্গরসময়ী ইন্দিকে এখন আর কেহ চক্ষে দেখিতে পায় না। শ্লেষ টিটকারীর জ্বালায় সে ঘরের কোন্ আশ্রয় করিয়াছে ; বর্ষিয়সীদের গালি গঞ্জনা অবজ্ঞা নাক-সিঁটকানির ঝড়ে পাতাছেঁড়া ডালভাঙ্গা শ্রীহীন গাছের মত সে যেন কেমন একরকম হইয়া গিয়াছে। এত উপহাস এত তাড়াহুড়া কেন গা ? তাহার আবাল্যসঙ্গী পূজার—সেবার আরাধনা কামনার শিব-ঠাকুরটিকে সে স্বামীরূপে পাইবে, তাহাতে গতর-খাকীদের এত গায়ের জ্বালা কেন ? একটা সুখের আতিশয্যে মনের দম বন্ধ হইয়া তাহার অন্তরে কেমনতর যেন শান্ত জমাট রকমের ঘোর লাগিয়া রহিয়াছিল, তবু সে শান্তির ভিতর একটা অনির্দ্দিষ্ট ভয় চাপিয়া বসিয়া গুরগুর করিতেছিল। যাহাতে এত আনন্দ এমন প্রেমমগ্নতা, তাহা কি সত্যই পাপ ! এ যেন উপরে টালমাটাল ঢেউ, আর অন্তরে চরম শীতল শান্তির অতল তল।

বাল্যকালে মতিকে না হইলে ইন্দির খেলা ধূলা কিছুই ভাল রকম হইত না, মতি কিন্তু তাহাকে মন-রাখা স্তোকবাক্যে ভুলাইয়া সুঁদির তল্লাসে ঘুরিত। কিন্তু জগদম্বা ঠাকুরাণী কন্যা লইয়া গ্রামত্যাগ করিবার পর হইতে তাহারই ত একটানা সুখের দিন গিয়াছে। মাঝে

বিবাহ ও অকাল বৈধব্য, কিন্তু সে বিড়ম্বনাও ক্ষণস্থায়ী,—আসিল আর গেল। তাহার পর সারাদিন মতির সহিত ঘুরাফিরা, রাত্রেও মতির মাতা সৌদামিনীর গৃহে প্রদীপের নিকট পাঠরত মতির কাছে মাটিতে পড়িয়া ঘুমান। এত কালের প্রায় অবিচ্ছিন্ন প্রীতির গাছে আজ রাঙ্গা ডগডগে সতী সৌভাগ্যের ফুল ফুটিতে চলিল। ইন্দি অন্তরের অন্তরে লজ্জায় মরিয়া গিয়া বলিতেছিল, "হে ঠাকুর, এ যদি পাপ হবে তবে নারী-জন্ম দিয়ে এমনতর প্রাণে বধিলে কেন? তোমার বিশ্বজোড়া সৃষ্টি রয়েছে, তার মধ্যে এই নিধিটুকু কি ভালয় ভালয় অভাগীর আঁচলে বেঁধে নিতে দেবে না?"

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।



রাধুর পরিচয়।

শ্রীরাধিকাচরণ বসুর তিন কুলে কেহ নাই। বয়স পঁচিশ পার হইয়াছে, ফুটন্ত চাঁপার বর্ণ, দীর্ঘ বলিষ্ঠ শরীর, কোঁকড়া কোঁকড়া বাবড়ী চুল, সাজ সজ্জায় সর্ব্বদা ফিটফাট বাবুটি। রাম বসু মরিবার সময়ে উচ্ছৃঙ্খল বখা ছেলেকে কাছে বসাইয়া মাথায় হাত দিয়া কেবল এই একটি কথা বলিয়া গিয়াছিলেন, "দেখ্ বাবা, যাই করিস্ আমার মুখ কেবল হাসাস্‌নি।" রাধিকা তখন মৃতকল্প পিতার পায়ের উপর পড়িয়া হাপুস্ নয়নে কাঁদিয়াছিল। রাম বসু নগদ প্রায় পঞ্চাশ হাজার টাকা, তেজারতির কারবার এবং চন্দনার পথে এক শ' বিঘা মেঠো জমি রাখিয়া গিয়াছিলেন; দুই দিন যাইতে না যাইতে কিন্তু মরা বাপের পা ধরিয়া এই কান্না রাধু ভুলিল, মনের সাধে বখিয়া যাইবার পথ খুঁজিয়া লইল। ফলে তেজারতি শিঙ্গা ফুঁকিল, জমিজমা অধিকাংশ বন্ধক পড়িল। পিতার বিষয় বুদ্ধির কিছু অংশ উত্তরাধিকারীসূত্রে পাইয়াছিল বলিয়া তিন বৎসর রমারম মজা উড়াইয়া রাধু একদিন খরচের হাত খাটো করিল, তখন যাহা আছে তাহা রাখিয়া খাইলে একরকম করিয়া চলে। মদ কুসঙ্গ ঘুচিল না বটে; কিন্তু রাধু একেবারে ফতুর হইল না।

রাধিকার নামে এ অঞ্চলে বাঘে গরুতে এক ঘাটে জল খায়। আরামবাগ বর্দ্ধমান ও মেদিনীপুর অঞ্চলে যত গুণ্ডার দল ছিল তাহারা সকলে রাধিকাকে সর্দ্দার মানিয়াছিল। তাহার কারণ মাড়োয়াড়ী

পটীর অগ্নিকাণ্ড ও ভীমগড়ের দাঙ্গা। আরামবাগে রতন শেঠের ফেলাও কারবার,—কুঠি গুদাম আড়ত অনেক। রতনের চরিত্র ভাল ছিল না, এইসূত্রে নিধে গুঁইএর সহিত তাহার ঝগড়া বাধে। নিধের পক্ষ হইয়া রাধু বোস আরামবাগের মাড়োয়াড়ী পটীতে আগুন লাগাইয়া রতন চাঁদের লক্ষাধিক টাকার ক্ষতি করে। মোকদ্দমা বাধে বটে, কিন্তু রাধুর বিরুদ্ধে সাক্ষী দিবে তেমন বাপের বেটা এ অঞ্চলে কে আছে, ঘাড়ের উপর মাথাই বা কাহার কয়টা থাকে? অগত্যা রতন রাধুকে নিজের বগিতে হাওয়া খাওয়াইয়া মদ ও নানা সিধা ভেট দিয়া ঝগড়া আপোস করিয়া লইয়াছিল।

নিধে ওরফে নিধিরাম গুঁই শ্যামচাঁদ গুঁইএর ছেলে। সে দেখিতে তেমন বলিষ্ঠ নয়, কিন্তু বুদ্ধিতে বৃহস্পতি। কালো কোলো, সুশ্রী, বয়সের আন্দাজে মুখ নিতান্ত কচি, যেন কোন রসিকা বৈষ্ণবী খঞ্জনী ফেলিয়া রসকলি মুছিয়া পুরুষ সাজিয়াছে। তাহার পিতা শ্যাম গুঁইয়ের আট দশটা গরুর গাড়ি ও তিনটা আটচালা আছে। গাড়ী গুলা জন মজুরের অধীনে ভাড়া খাটে এবং বসতবাটী ছাড়া অপর চালা গুলিতে পোদ্দার হালুইকর ও ধোপারা ভাড়া লইয়া আছে। শ্যাম গুঁই এখন বুড়ো হইয়াছে, সুঁটকো লোলচর্ম্ম রূপী বাঁদরটি আর কি; উপযুক্ত পুত্রের হস্তে সংসারের ভার দিয়া কুঁজো হইয়া দাওয়ায় বসিয়া এখন তামাকু টানে আর খক্ খক্ করিয়া কাসে। নিধি জাহানাবাদের ইন্সপেক্টর ঈশ্বর ঘোষকে উস্তম্ ফুস্তম্ করিয়া তুলিয়াছিল। তাহার পর মথুরার আমলের প্রারম্ভে বড় নায়েব গুড়গুড়ে ভটচায ভীমগড়ের প্রজাদের উপর যখন বড় জুলুম আরম্ভ করে, তখন রাধু বোস নিধুর সহিত একযোটে প্রজাদের পক্ষ হইয়া লাঠি ধরে। এই মণিকাঞ্চনযোগ ঘটিবার পর নিধি এতই দুর্দ্ধর্ষ হইয়া উঠিয়াছে, যে ঈশ্বর ঘোষ আর

তাহাকে আঁটিয়া উঠিতে পারেন না। অনেক মোকদ্দমার কিনারা হয় না দেখিয়া নিধির সহিত তিনি এইরূপ রফা করিলেন, যে, বর্দ্ধমান মেদিনীপুর ও বনবিষ্ণুপুর অঞ্চলে কোন গোলযোগ বাধিলে তিনি নিধির পক্ষে থাকিবেন এবং নিধিও জাহানাবাদ এলাকার মধ্যে শান্তি রক্ষা করিবে এবং তাঁহার প্রাপ্য টাকাটা শিকেটার প্রতি নজর রাখিবে। বড় দায়ে ঠেকিয়াই ঈশ্বর ঘোষের এই রফা করা, কারণ মোকদ্দমার কিনারা না হইলে বেচারীর পেটের ভাত লইয়া টানাটানি পড়ে। এই নিধি এখন রাধুর দক্ষিণ হস্ত। আরামবাগে সে আর বড় একটা থাকে না, রাধুর আড্ডায় মসীদবেড়েয় পড়িয়া গাঁজা ভাং খায়। পূর্ব্বেই বলিয়াছি এ মণিকাঞ্চন সংযোগ ঘটিল ভীমগড়ের কাণ্ড লইয়া। গুড়গুড়ে ভটচায জমিদারীর ভার পাইয়া যখন আঙ্গুল ফুলিয়া কলাগাছ হইল, তখন এ তালুকে ও তালুকে দুই চার ঘর প্রজা ঠেঙ্গাইয়া হাত আসিলে তিন বৎসরের অনাদায় উসুল করিতে সদলবলে ভীমগড়ে আসিয়া দেখা দিল। সেখ করিমদ্দী সেখানকার বর্দ্ধিষ্ণু প্রজা, সেই বিদ্রোহী; তাহার বলে বল পাইয়া ভীমগড়ের প্রজারা জমিদারের পাইককে লাঠি মারিয়া নাস্তানাবুদ করিয়া গ্রামের বাহির করিয়া দিয়াছিল। আজ তিন বৎসর পর মথুরা ও গুড়গুড়ে ভটচায একযোট হইয়া তাহার শোধ লইল। তাহাদের লাঠিয়ালের লাঠির চোটে রক্তগঙ্গা বহিল। তাহারা স্ত্রীলোকদিগকে উলঙ্গ করিয়া কাচ্চা বাচ্চাদের বিচুটিপেটা করিয়া গরু বাছুরের দড়াদড়ি সব খুলিয়া দিল। ধানের মরাইয়ে মরাইয়ে আগুন দিল, যত হাঁস মুরগী সব জবাই করিয়া রাখিল। তাহার পর ছবির শেখ ও করিমদ্দী চাচাকে বাঁধিয়া গুয়ের গাছে গলা অবধি ডুবাইয়া তাহার সুরূপা যুবতী কন্যাকে নায়েবের কাছারীতে ধরিয়া লইয়া গেল। ঠিক সেই সময়ে রৈ রৈ করিয়া রাধিকা ও নিধির দল ডাকাত-পড়া করিয়া

আসিয়া পড়িল। সে দাঙ্গায় গুড়গুড়ের ভাই গোবিন্দলাল ও তিন জন পাইক খুন হয়, সাত জন জখম হয়। মোকদ্দমার কোন কিনারা হয় না, ভটচাযকে জুতা ফেলিয়া মুক্তকচ্ছ দশায় পলাইয়া প্রাণ বাঁচাইতে হয়। লোকে বলে করিমদ্দীর মেয়ে জহুরণের উপর নিধির নেক নজর ছিল, তাহাকে লইয়াই পূর্ব্বে রতন শেঠের সহিতও কলহ ঘটে। সে আজ চার বৎসরে কথা।

মতি যখন পাশ করিয়া গ্রামে আসিয়া বসিল, তখন গুড়গুড়ের সহিত রাধুর দা-কুমড়া সম্বন্ধ। মতি মনের মত মানুষ খুঁজিতেছিল, কারণ তাহার বাল্যের স্বপ্ন-বীজ যৌবনের উর্ব্বর ভূমিতে রুইয়া ফসল জমাইতে হইবে। "উত্থায় হৃদি লীয়ন্তে দরিদ্রাণাং মনোরথাঃ"—সে কথা ঠিক বটে, কিন্তু অর্থের দারিদ্র্যই দারিদ্র্য নয়; সহায় লোকবল ভাবের বলও চাই। অর্থ এ অঞ্চলে আছে মতি ছাড়া আর একজনের—রাধুর। রাধুকে কিন্তু ডাকিতে হইল না। একদিন মতি সন্ধ্যার সময় পদ্মদীঘীর ঘাটে বসিয়া চিন্তার সাগরে হাবুডুবু খাইতেছে, এমন সময়ে একজন মহা সাজগোজ করা লম্বা গৌরকান্তি পুরুষ মস্ মস্ শব্দে আসিয়া পড়িয়া মতির হাতটা টানিয়া লইয়া খুব এক চোট কজ্জিঢিলে করা রকমের ঝাঁকি দিয়া নাড়িয়া দিল, তাহার পর একটা মোড়া টানিয়া লইয়া ধপাস করিয়া বসিয়া পড়িয়া ষাঁড়ের মত গলায় হাঁক ছাড়িল, "ওরে, কে আছিস,তামাক আন রে। কায়েতের হুঁকো"—(সহজ স্বরে) হা হা হা, তারপর মতি দা', তিনটে নাকি পাশ করে এয়েচ? তোমার জোলো ছিটে ফোঁটা মাঙ্গনা ওষুধের জ্বালায় এরি মধ্যে কান্তি ডাক্তার তো ফেল হবার যোগাড়। আজ কাল এ গাঁয়ে লোকও মরচে কম। এই যে, নি এস, নি এস, তামাক না খেতে পেয়ে প্রাণটা আনচান করচে।"

মতি তো হতভম্ব। একেবারে বাড়ী চড়াও হইয়া আলাপ করা!

কিছু কথাবার্ত্তার পর মতি জিজ্ঞাসা করিল, "তোমার নাকি কাকার সঙ্গে বনে না?"

রা। কৈ না, কেন? কর্ত্তা তো খাসা লোক। আমার ঝগড়া গুড়গুড়ে শালার সঙ্গে, ও বাঞ্চোৎ গরু। হা হা হা হা হা।

মতি। আ ছি, গাল মন্দ দাও কেন?

রা। হেঃ, গাল শুধু? শ্রীকোৎকার আশীর্ব্বাদ ছাড়া ও সব কুকুর সিধে থাকে না। গুঁতোর নাম বাবাজী। হো হো হো হো হো।

মতি। মেরে কি মানুষকে শুধরান যায়? যে নিজে ভাল সেই পরকে ভাল করতে পারে। তুমি কি নিখুঁৎ? এ জাতের জীবন সমাজের পাথুরে বাঁধে আটকে পচিয়ে তুলেছে, ঐ বাঁধ কেটে দিতে হবে।

রাধু মতির পায়ের ধূলা লইল, তাহার পর তামাক টানিতে টানিতে বলিল, "তবে ঠাকুরের আমার মত ষাঁড় বলদ গড়বার দরকার কি ছিল? আমি তো আর জবরদস্তি উড়ে এসে ঠাকুরের ঘাড়ে চাপি নি?" মতি এই প্রসঙ্গে সমাজ সংস্কারের পরহিতের কথা পাড়িল।—কর্ম্মহীন হিন্দুসমাজ বেগ অভাবে পাঁকে পানায় ভরিয়া উঠিয়াছে। কর্ম্ম না শিখাইলে, ছোট স্বার্থে এ বিষম কামড় ছাড়াইয়া কোন বড় স্বার্থের নেশায় না ক্ষ্যাপাইলে, এ জাতির উদ্ধার নাই। রাধুর যতক্ষণ তামাকের পিপাসা ততক্ষণ শুনিল, তাহার পর হাই তুলিয়া দুই তিনটা তুড়ি দিয়া কথার মাঝখানে উঠিয়া পড়িল।

সে দিন সুবিধা হইল না; তাই মতি আর একদিন স্বয়ং তাহার আড্ডায় গিয়া উপস্থিত হইল। রাধুর অর্থ আছে, সংসার বন্ধনও নাই, কিন্তু চরিত্রবল কোথা? রাধিকাও এক রকম পরহিত করে, কিন্তু তাহার মূলে মোড়লীর লোভ ও বিপদের আগুন লইয়া খেলিবার

নেশাই সবটুকু। তবু তাহার মধ্যে কোন মহাপ্রাণতার জ্যোতিঃই কি নাই ? একবার এই মণির আবর্জ্জনা ধুইয়া মাজিয়া তাহাই দেখিতে হইবে। মতি যখন আড্ডায় উঁকি মারিল, তখন মদের নেশায় চুর্ রাধু তাকিয়া হেলান দিয়া স্খলিত স্বরে গাহিতেছে,—

"আ খেলে যা কচুপোড়া
ঐখানে ল্যাজ নাড়াচ্চে।
সঙ্গে নিয়ে দড়ি দড়া
তোমার লেগে পাড়া পাড়া
শম্ভু ধোপা বেড়াচ্চে।"

তাহার পরিধানে গিলে কোঁচান মিহি শান্তিপুরে ধুতি ও পাঞ্জাবী, বুকে গোলাপ ফুল, টিকিতে বেল ফুল, কানে আতরের তুলা, হাতে রঙ্গিন তাল পাতার পাখা! নফর গোসাই ঘাড় কাৎ করিয়া তবলায় চাঁটি মারিতে মারিতে তালে বেতালে মাথা ঝাঁকি দিতেছে, আর নিধি তরল দশায় দাঁড়াইয়া হাত নাড়িয়া কোমর পাছা দোলাইয়া বাইওয়ালীর মত নাচিতেছে। মতি নিঃশব্দে সরিয়া পড়িল। এত দূর চরিত্রহীনের দ্বারা কি কোন মহৎ কাজ হয়? মতি নির্ভরসা হইয়া হাল ছাড়িয়া দিল।

আর একদিন হাট-বারে হাটে মতির সহিত তর্কালঙ্কার ঠাকুরের দেখা। বুড়া একগাল হাসিয়া হাতের রুই মাছটা ধপাস করিয়া মাটীতে ফেলিয়া বলিলেন, "এই যে! কোথায় থাক? কাল আড্ডায় এলে না কেন? তোমায় ফেলে কোন একটা গোছগাছই হয়ে উঠচে না। তুমি ভায়া আমার একাধারে উনপঞ্চাশের সব ক'টি আর আমি হলেম গে সাক্ষাৎ আশ্বিনে মেঘ, আমার সঙ্গে তুমি জুটে পড়লে তবে না একটা রৈ রৈ ঘনঘটা লাগে।"—আকাশকে উদ্দেশ করিয়া, "ভায়া

আমার বলে বেশ্, না হে ? এমন আধ ঘণ্টা বুলি চালি কেটে পুরো এক বোতলের বুঁদ নেশা জমিয়ে দিতে অপর কারুখে দেখি নি। (মতির দিকে ফিরিয়া) হাট কত্তে এয়েছ নাকি ? বাড়ীর সব মঙ্গল তো ? হ্যাঁ হে, সেটার কি হল ? মদন স্যাকরার—”

সামনেই একটা ঘোর কলহ আরম্ভ হইয়া কথার বাকিটা ডুবাইয়া দিল। গুড়গুড়ে কিছু দূরে পদ্মলোচনের দোকানে বসিয়া তামাকু টানিতে টানিতে আড়-চোখে দেখিতেছিল, আর পরশুরাম জেলে-বৌয়ের সহিত একটা বড় মাছ লইয়া টানাটানি বাধাইয়াছিল। পরশু-রাম নায়েবের লোক, গুড়গুড়ের জন্য সে লতিফের চালের বড় কুমড়াটা, রতন বক্সির প্রথম কলার ছড়াটা, জেলে-বৌয়ের ঝোড়ার ভাল মাছটা তোলা-স্বরূপ আদায় করিয়া বেড়ায়। অনেক সহিয়া সহিয়া আজ ধৈর্য্য হারাইয়া ক্রুদ্ধা জেলে-বৌ মাছের লেজের দিকটা ধরিয়া চোখ মুখ ঘুরাইয়া বাঁ পায়ের লাথি দেখাইয়া “অলপ্পেয়ে ড্যাকরা হাড় হাবাতে মিন্সে ! তোর মুখে নুড়োর আগুন জেলে দি, আঁস বটি দে তোর নাক কাণ কচকচিয়ে কাটি” ইত্যাদি মধুরালাপে পরশুরামের চৌদ্দ পুরুষের স্বগতি করিতেছিল। মাঝে পড়িয়া মতি ও তর্কালঙ্কার ঠাকুর “হাঁ হাঁ করিস্ কি মাগী, করিস্ কি ?” বলিয়া মিটাইয়া দিতে সবে যাইতেছেন, এমন সময়ে এক সশব্দ ভীম চপেটাঘাত কোথা হইতে আসিয়া পরশুরামের বাঙ্গলা পাঁচের মত মুখখানি বাঁকাইয়া দিল। সে কতকটা থু থু ও রক্তের সহিত গোটা কয়েক ভাঙ্গা দাঁত “হোয়াক” করিয়া ফেলিয়া কদর্য্য ভাষায় গালি দিয়া উঠিল। যে মারিয়াছিল সে রাধু বোস, সামনে আসিয়া নাকের কাছে নাক লইয়া মুখ ভেঙচাইয়া রাধু তদুত্তরে যাহা বলিল, অশ্রাব্য ভাষায় পণ্ডিতা জেলে বৌ অবধি তাহা শুনিয়া পরম পুলকিতা হইয়া দু’ চারটা বাছা বাছা কথায় তাহার অনুমোদন করিল।

মতি। ছিঃ রাধু; ওকি ওকি! পরশুরাম তোমার বাপের বয়সী যে! ছি ছি, রক্তারক্তি! অসভ্য পাশব কাণ্ড!!

"সরো কর্ত্তা!" বলিয়া এক ধাক্কায় মতিকে সরাইয়া রাধিকা পায়ের চটি খুলিয়া পলায়মান পরশুরামকে বেদম মারিল; বার বার ছাড়াইতে যাওয়ায় মতির মাথায় ও তর্কালঙ্কার ঠাকুরের ভুঁড়ির উপরও ঘা কতক পড়িল। পরশুরাম পলাইল দেখিয়া জেলেবৌ তাহার স্বর্গগত পিতৃদেবের মুখে নিজের বাঁ পায়ের "নাতি" ও কাঁচা কুখাদ্যের ব্যবস্থা করিয়া সাশ্রুনেত্রে গললগ্নবাসে রাধুর পায়ে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিল, তাহার পর গজগজ করিতে করিতে গিয়া ঝোড়া লইয়া গোঁজ হইয়া মাছ বেচিতে বসিল।

পিটনচণ্ডী দেওয়ারূপ সৎকার্য্য হইতে অবসর হইয়া রাধু তর্কালঙ্কারের পায়ের ধূলা লইয়া ব্যস্ত সমস্ত ভাবে বলিল, "ব্রাহ্মণ দেবতার গায়ে জুতো লেগেছে, মাপ কোরো, ঠাকুর, দোষ নিও না।"

মতি। বুড়ো মানুষকে মেরে বড় খারাপ কাজ করলে; পরশুরাম যে তোমার বাপের বয়িসী। তোমরা সভ্যতা শিখলে না, নৈতিক জীবন—

রাধু। পায়ের ধূলো দেও, দাদা, তুমি বিদ্বান, দেবতার তুল্য। ও গর্ভস্রাবের কথা ছাড়।

তর্কা। আরে থাক্ থাক্। রাধে মাধব বল! রাগ না চণ্ডাল! মানুষকে খামকা মারতে আছে?

রা। রাখো ঠাকুর, ও তোমার পিলেপটকা দয়াধর্ম্মে আমার কাজ নেই। (চেঁচাইয়া পদ্মলোচনের দোকানে বসা নায়েবকে শুনাইয়া) শাস্তর কি করবে, এসব মামদো ভূত গোভূতের ওষুধ হ'লো গে পয়জার। যাদু বাছার কম্ম নয় গো, বাপু বাছার কম্ম নয়। পেছনে সম্বন্ধীরা সব

উস্কে দেবার জন্যে আছে, নইলে ও গুয়োরবেটা আবার এখানে ফুটুনি কত্তে আসে?"

ইহার পর নায়েব, আস্তে আস্তে উঠিয়া যেন কিছু হয় নাই এমনি ভাবে সরিয়া পড়িল। "ও গুয়োর সন্তান যাও যে" বলিয়া অজস্র গালি পাড়িয়া রাধুও চলিয়া গেলে তর্কালঙ্কার হাসিয়া বলিলেন, "আরে বাপ রে! কি রোখ দেখেচ?"

মতি। সবই ভাল, কেবল চরিত্রটা খারাপ করে ফেলেছে।

তর্কা। সিংহ-রেশে লোকের একটু আধটু কাদায় কি করবে গো? ওদের থাবায় অমন এক আধটুকু কাদা লাগলে চেটেই মেরে দেবে। যে আধারে এত শক্তি সে আধারে ভোগের পেছনে পেছনে কলিকল্মষ-নাশিনী জাহ্নবী বইচে; ভোগ শেষ হলেই আবার যে শুদ্ধ সেই শুদ্ধই।

মতি। হুঁঃ! এক কলস দুধে এক কণা গোমুত্র, জানেন তো?

তর্কা। আরে ছ্যাঃ! সে তামস প্রকৃতি সাধারণ জীবের কথা। সত্ত্ব আর রজঃ যে গণ্‌গণে আগুন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

অপূর্ব্ব বিবাহ।

তখন সন্ধ্যাকাল! পশ্চিমের আবিরঢালা রাঙা আকাশ সবেমাত্র নীল ও কালোর আমেজে মিশিয়া বেগুণী আভা ধরিতেছে। আজ রাত্রে যে বিবাহের লগ্ন, তাহা কেহ বিন্দুবিসর্গও টের পায় নাই। বরযাত্রীর দল দূরে চন্দনার বাজারে জমা হইয়া বাজনা বাদ্য বন্ধ রাখিয়া সমস্তটা পথ মাঠে মাঠে চলিয়া আসিয়াছিল, এখন গ্রামপ্রান্তে আসিয়া আলো জ্বালিয়া ব্যাণ্ড্ বাজাইয়া হুড়মুড় করিয়া গ্রামের মাথার উপর আসিয়া পড়িয়াছে। গোপীনাথপুরে একটা রৈ রৈ রব পড়িয়া গেল। একটা সৃষ্টিছাড়া ডাকহাঁকের মধ্যে মথুরের দল জমা হইতে লাগিল; কার্ত্তিক দত্তের বাটী পঁহুছিবার পূর্ব্বে বরযাত্র ঠেকাইয়া রাখিবার বা কন্যা চুরি করিবার এখন উপায়? পথে প্রায় মুক্তকচ্ছ গঙ্গানারায়ণ ঠাকুর উত্তেজনার বশে ঠেলিয়া বাহির করা চক্ষু দুইটি জবা ফুলের মত লাল করিয়া মরিয়া হইয়া পাল্কীর মধ্যে মুখ ঢুকাইয়া বলিলেন, "হুঁ। হে মতি! একেবারে মজালে হ্যা?"

পাল্কীর দ্বার ধরিয়া প্রায় গড়াইয়া গড়াইয়া এক মহাপিণ্ড যাইতেছিল। এ যেন একটা দ্বিপদ কচ্ছপ খাড়া হইয়া মাথায় পাগ্ বাঁধিয়া চলিয়াছে, তাহার জালার মত পেটের উপর সোণার ঘড়ির চেন হিমাচলবক্ষস্থা নির্ঝরিণীর মত চিক্ চিক্ করিতেছে। পিণ্ডের নাম দুর্গামোহন লাহা। সে পণ্ডিতকে এক ধাক্কায় প্রায় "পপাত চ মমার চ"

করিয়া বলিল, কে হ্যা বেল্লিক? উড়ে বেয়ারা নাকি? তা'লে পাল্কির ডাণ্ডা ধর গে; বরের কাছে হুমকি দাও কেন?"

উৎফুল্ল বরযাত্রীর দল জানিত না তাহাদের মাথা লইয়া ভাঁটা খেলিবার জন্য কার্ত্তিক দত্তের পুষ্করিণীপ্রান্তে কলাঝোপে পঞ্চাশজন লাঠিয়াল জমা হইয়াছে। তাহারা মনের সুখে হল্লা করিতে করিতে যাইতেছিল। আবার লাঠিয়ালের দল জানিত না যে মানুষে গড়ে আর বিধি ভাঙ্গে; তাহাদের চুরির উপর বাটপাড়ি করিবার বাস্তুঘুঘুও জুটিয়াছে। তাহার কারণ বলি; যখন বরযাত্রী আসে আসে, তখন রাধিকাচরণ আড্ডায় বসিয়া তামাকু টানিতে টানিতে বেসুরা গলায় গান ধরিয়াছিল,—

"বোষ্টমী তোর রাঙ্গা যৈবন ফাঁদে
(পড়ে) বোষ্টমের মন কাঁদে
তোর লাগি লো খঞ্জনী তার
রাধে রাধে সাধে।"

এই সময়ে দরজায় হঠাৎ খঞ্জনী বাজিয়া উঠিয়া চন্ করিয়া রাধুর মদের গোলাপী রেশটা কাটিয়া দিল, সঙ্গে সঙ্গে বড়ই মিঠা স্ত্রীকণ্ঠে ঠিক ঐ সুরে কে গাহিল,—

"পার কর মোর নেয়ে
তোমার মতন কে বাঁচায় গো
অকূলে কূল দিয়ে।"

নিধে গুঁই তক্তপোসের উপর উবু হইয়া বসিয়া মুদ্রিতচক্ষে তামাক টানিতেছিল, সে হুঁকা হাতে অর্দ্ধেক খাড়া হইয়া সেই রকম বাঁকা ভাবেই হাঁ করিয়া রহিয়া গেল। দ্বারনির্বদ্ধদৃষ্টি রাধুও হাতড়াইতে হাতড়াইতে আন্দাজে হুঁকাটা পিছনের দিকে রাখিয়া হতভম্ব ভাবে

বসিয়া রহিল। বিস্ময়ের কারণ ছিল, কারণ সিংহবাহিনী জগদ্ধাত্রী, বুঝি তাঁহার বাহন সিংহটিকে কোথায় বনে ঝাড়ে বসাইয়া পদব্রজে এই মাতালের আড্ডায় আসিয়া উঁকি মারিতেছিলেন। গান থামাইয়া দেবী তাঁর বীণানিন্দী কণ্ঠে একটু বিদ্রূপের টান মিশাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "রাধু বোসের আড্ডা কোথায় গা?" তখনও কাহারও বাক্যস্ফূর্ত্তি ঘটে নাই, নিধে গুঁই কেবল ঢোক গিলিতে গিয়া কোঁক্ করিয়া একটা অস্ফুট আওয়াজ করিয়া মাথা নাড়িয়াছে মাত্র। এই নিরুত্তর অভ্যর্থনায় খাপ্পা সিংহবাহিনী এলো চুলের মহা তরঙ্গ দোলাইয়া আরো ঘৃণায় রাঙ্গা টুকটুকে ঠোঁট বাঁকাইয়া বলিলেন, "তাই তো! শুনে এলুম রাধু বোসের ভয়ে এ গাঁয়ে বাঘে ছাগলে এক ঘাটে জল খায়। কৈ, তার তো কিছুই দেখি নে? এ গাঁয়ে কি তবে পুরুষ বাচ্ছা নেই গা?" জমিদার কাছারীর এক শ' লেঠেলা কাত্তিক দত্তের মেয়ের ধম্ম নেবে, আর যত সব শতেক খোয়ারীর পো-রা ঠায় বসে বসে দেখবে?"

দজ্জাল দেবতা অন্তর্হিতা হইলেন। সঙ্গে সঙ্গে সজ্ঞালাভ করিয়া নিধে একলাফে তক্তাপোসের নীচে নামিল, দরজার বাহির হইয়া পথে কাহাকেও না দেখিতে পাইয়া অন্ধকারে ভোঁ দৌড় দিল। হাঁপাইতে হাঁপাইতে নিধে ফিরিয়া আসিলে রাধু জিজ্ঞাসা করিল, "মাগী কে রে?"

নি। স্বয়ং মা দুগ্‌গো গো দা'ঠাকুর, স্বয়ং বৈকুণ্ঠের নক্ষী। আহা, কিবে রূপ, কিবে ভঙ্গি! কাত্তিক দত্তের ঐ বাগে গিয়ে উপে গেল গে!

রা। দূর্ ব্যাটা!

নি। হ্যাঁ গো, ঐ শ্লেও! আমার দু'চক্ষির সামনে দেকৃতি দেকৃতি খপ্ করে মিলিয়ে গেল। আর উনি কইলেন, "দূর ব্যাটা"।

রাধু পা ঝাড়া দিয়া উঠিয়া ঘরের কোণ হইতে একটা সাড়ে চার হাত লম্বা গাঁঠবাঁধা তেল-কুচকুচে লাঠি লইয়া বাহির হইয়া পড়িল। দুর্দ্দান্ত রাধু বোসকে মুখের উপর দাঁড়াইয়া এমন গালি আর কেহ কখন দেয় নাই। রাধু রাগিবে কি, বিস্ময়ের আধিক্যে তাহার রাগটা জ্বলিয়া জ্বলিয়া উঠিয়া ক্রমাগতই চাপা পড়িয়া যাইতেছিল। দা'ঠাকুরকে উঠিতে দেখিয়া নিধেও ঝুঁকিয়া তাড়াতাড়ি তামাকে গোটা দুই মারাত্মক রকমের দম্ মারিয়া কাসিতে কাসিতে ডাকিতে ডাকিতে লাঠি হস্তে বাহির হইয়া পড়িল,—"ওরে ক্যাঙ্গালী, ও তুষ্টু। (খেই খেই থক্) ও ধম্মদাস, (থ্যাক্-খেই-খেই)। চাঁড়াল পাড়ায় একটা হাঁক দে আসিস্ রে-এ-এ ও-ও-ও-ই—।

দূরে বরযাত্রীর সানাই বাজিতেই কাত্তিক দত্তের বাটীতে বুড়া তর্কালঙ্কার ঠাকুরের হেফাজতে কোথা হইতে ফরাস আলো ফানুস সানাই পুরোহিত জুটিয়া পড়িল। গুড়গুড়ের দল কলা ঝাড়ের আড়ালে ওৎ পাতিয়াছিল, সামিয়ানা খাটান আলো জ্বালার তাড়াহুড়ায় বাধা দিল না। তাহার পর ক্রমশঃ দূরের ব্যাণ্ড কাছে আসিতে আসিতে পথ আলো ও সরগরম করিয়া শোভা যাত্রা দেখা দিল। তখন পথে ভয়ঙ্কর ভিড়; গুড়গুড়ের দলের পঞ্চাশজন লাঠি হাতে তাহার মধ্যে মিশিয়া দাঁড়াইয়াছে। আর সেই অবসরে রাধুর দল তাহাদের পরিত্যক্ত কলা-ঝোপ অধিকার করিয়া তাহাদের ঘাড়ের উপর পড় পড় হইয়াছে। প্রথমে পাল্কীর এদিকে ওদিকে গোটাকয়েক ঢিল পাটকেল আসিয়া পড়িতে লাগিল, তাহার পর ঠেলাঠেলি হুড়াহুড়ি। পাল্কীর দ্বার ধরিয়া একদিকে স্বয়ং তর্কালঙ্কার এবং অপরদিকে সেই কুমড়ো-গড়ানে সচল গন্ধমাদন দুর্গামোহন। পাশে পাশে হ্যাটকোটধারী শ্রীপতি সরকার চোগাচাপকান ও পিরিলী পাগড়িধারী ইন্দুনারায়ণ প্রভৃতি আরো মতির

কলিকাতার ইয়ার বন্ধুর দল। মতির মাতা সৌদামিনী ঠাকুরাণী রাখা-নগরের মেয়ে, সেখান হইতেও অনেক লোক আসিয়াছে।

যখন প্রথম ঢিল পড়িল তখন কোথা হইতে সেই রূপের ডালি বৈষ্ণবী আসিয়া পাল্কি ধরিয়াছে, সে বঙ্কিম গ্রীবা আরও বঙ্কিম করিয়া সমস্ত জনতাকে উদ্দেশ করিয়া বলিল, "ওরে রাঁড়িপুতরা, তোদের মা বোন নেই নাকি রে!" একটা ঢিল আসিয়া বৈষ্ণবীর কপালে লাগিয়া রক্তধারা বহিল, কালো চুলের ঢেউয়ে সে রক্তস্রোত মিশিয়া গৈরিক অঞ্চল আরক্ত করিতে লাগিল। তাহার পর ঝড়ে যেমন ধান'গাছ মাটি সই হইয়া শুইয়া পড়ে, লোকের ভিড় তেমনি ছিটকাইয়া পড়িতে লাগিল। খালি গায়ে মালকোচা মারা রাধু বোস আর নিধে লাঠি ঘুরাইয়া দুই দিক হইতে পড়িয়াছে।

গুড়গুড়ের হুকুম ছিল কৌশলে অল্পবিস্তর মারধর করিয়া বরযাত্রা ভাঙ্গিয়া দিবে, বেগতিক দেখিলে কার্ত্তিক দত্তের ঘরে ঢুকিয়া মেয়ে লইয়া পলাইবে। কিন্তু রাধু জুটিয়াছে, এখন কিছু করিতে গেলেই রক্তগঙ্গা বহা অনিবার্য্য। অগত্যা বুধুই মোড়ল নিজের দল হটাইয়া কিংকর্ত্তব্য স্থির করিতে পদ্মলোচনের আড্ডায় ছুটিল। বরযাত্রাও এই অবসরে প্রাণ লইয়া কন্যার বাটীতে ঢুকিয়া পড়িল। তখনি লগ্ন, তখনই বিবাহ। স্ত্রী আচার প্রায় নমো নমো করিয়া সারা হইল। বাহিরে বিষম ভিড়, ক্রুদ্ধ জনতা ঠেলিয়া রাখা দায়। চার পাঁচ ঘণ্টার মধ্যে অভুক্ত লাঠি-সোঁটাধারী বরযাত্রীর দল কন্যা উঠাইয়া মসীদবেড়ে যাত্রা করিল। তাহাও নির্ব্বিঘ্নে ঘটিয়া উঠিল কেবল সঙ্গে একজন রক্তমুখ গোরা ছিল বলিয়া। "মাজিষ্টের সাহেব ঘোড়ায় আতি নেগেচে রে-এ-এ" বলিয়া একটা রব তোলায় গুড়গুড়ে ও রাঁধতারণের দল এ যাত্রা দূর হইতে গালি পড়িয়াই ক্ষান্ত হইল। যে আসিল সে লরেন্স'কার, মতির

কলিকাতার কলেজ-জীবনের সাহেব বন্ধু; গোলোযোগ দেখিয়া ঘোড়ায় চড়িয়া পুলিশ আনিতে আরামবাগে গিয়াছিল।

শেষ রাত্রে লাঠি বগলে রাধু আড্ডায় আসিয়া তামাক লইয়া বসিল। আজ যে সে কেন লাঠি ধরিয়া 'ইন্দি'র বিবাহ নিষ্কণ্টক করিয়া দিল তাহা তাহার নিজের কাছেই একটা জটিল রহস্য। মতির গ্রামে আসার পর হইতে রাধিকার চিত্তক্ষেত্রে একটা নূতন পাহাড়-ফাটা ঝরণার ক্ষীণ ঝরঝরে ধারা বহিয়াছে। সেটা মতির প্রতি তাহার একটা অহেতুক টান। তারপর যখন সে প্রথম ইন্দী ও মতির বিবাহের কথা শুনিল, তখন তাহা যে তাহাকে তেমন বিশেষ বেদনা দিল না ইহাতে রাধু নিজেই একটু আশ্চর্য্য হইল। মনে মনে একটু স্বস্তি বোধও করিল; যাহাকে পাই না অথচ দেখিলেই আঁকু পাঁকু করিয়া চাই, সে চক্ষের আড় হইলেই ভাল; তাহার ও আমার মাঝে হঠাৎ একটা উঁচু দুর্লঙ্ঘ্য দেয়াল খাড়া হইলে তাহাতে একটু মুক্তির মৃদু আরাম আছে। শুধু চখের টানে বা খেয়ালের প্রেমে এমনই হয়। তবু বিবাহের দিন যত ঘনাইয়া আসিতেছিল রাধুর মদের মাত্রাও ততই বাড়িতেছিল; মনে হইলে যে বড়ই ছটফটানি; সে অস্বস্তিটাকে ডুবাইতে তো হইবে। ইন্দীর মুখখানা বড় সুন্দর, সে কালো চখের অতল তল ভাবিলে আর মাথা ঠিক থাকে না। রাধু মনে করিয়াছিল বিবাহের দিন জাহানাবাদে সরিয়া পড়িবে। তাহার পর হঠাৎ লাঠি হাতে সেই রাঙ্গা ঝালর দেওয়া পাল্কীটার কাছে সে গেল কেন? কেন গেল সে রহস্য কে বলিবে? মাঝে সিংহবাহিনীর আবির্ভাব!—তাই কি?

"এই যে দা'ঠাকুর এয়েছ! তা' হ্যা দেখ দা'ঠাকুর বুধুইরে, সে শা -"। রাধু একটা ধমক দিল, তাহাতে নিধে দাঁড়াইয়া মাথা চুলকায় দেখিয়া অগত্যা রাধু "যা' যা', শুগে যা'" বলিয়া একটু নরম

রকম দাঁত খিঁচাইতে নিধে চটপট বাড়ীর ভিতর সরিয়া পড়িল। তাহার পর, আবার সেই সুখের ভাবনা। আহা! এতরূপ, "এও কি মানুষের হয়!! কপাল কাটিয়া রক্ত ঝরিল, একেবারে রাঙ্গা ডগডগে রক্তের ধারা বিসর্পিত চূর্ণ কুন্তলের ঘন কালো শোভায় কি মধুর প্রাণমাতান ভাব ধরিয়াছিল। তাহা দেখিয়া আচম্বিতে যেমন ব্যথা তেমনি সুখ, আঘাত পাইয়া অত বড় বদরাগী গোঁয়ারের দলের সামনেও সে চখের বিদ্যুৎ সে ঈষদানমিত গরিমাময়ী তনুর তেজ ত কমিল না! এই তো নারী, আহা এমন মেয়ে সত্যকার রক্তমাংসের হয় না!" তাহা হইলে ত রাধু এমন উচ্ছন্নে যায় না।

হুঁকা তাড়াতাড়ি রাখিয়া রাধু বাড়ী ফাটাইয়া হাঁকিল, "নিধে!" অমনি তড়াক্ করিয়া নিধে তৎক্ষণাৎ হাজির, "দা'ঠাকুর।"

রা। সে বোষ্টমী মাগী কোথাকার, খপর পেলি?

নিধে হাসি চাপিবার জন্য বার কতক গোঁফটা হাতে মাজিয়া সই করিয়া লইয়া বলিল, "আহ দা'ঠাকুর কিবেরূপ টো, এমন আর বাপের জম্মে দেখিনিক। একবার বক্‌নাডাঙ্গার ক্ষেত্তর কুমোর সেই দত্তদের ওখানকার জগদ্ধাত্তির ঠাকুর গড়েছেল ;আর এই, অ্যাক্কেবারে ঠিক এক গো ঠিক এক।"—

রা। তোকে কি জিজ্ঞেস করলুম?

নি। সেই তো তাইতো বলছিনু। দেখে চৈক্ষু ফিরতি নারে, তাই ভাবনু অন্দরে একবার ঢুকে পড়ি। গতরটা কাঁপতে নেগেছে আর এগুচ্ছি। ভেতরে দেখি মিত্তির বাড়ীর মা-ঠাকরুণ! হ্যাঁ দেখ দা'ঠাকুর, ও বাড়ীর যত ছ্যানাপোনা ভাই ভগ্‌গোর সক্কলে তো এ বিয়ের শত্তুর, তবে মা-ঠাকরুণ এলো কোথাত্তে গো? আহা, মা-ঠাকরুণের বড় দয়ার প্রাণ, আমায় দেখে বল্লেক, "কেও, নিধি না? আয়

বাছা একটু কিছু মুখ মিষ্টি কর্।" দৌড়িয়ে কলাপাতাতে খেনু, তবু চৈক্ষু তুলি মানুষটোরে 'দেখতি নারনু গো? ওখানেই দেঁড়িয়ে ছেল, যেন সমস্তশরীরেত্তে ক্যামনতর ঝলস্ উঠতিছেল।

রা। কোন্ গাঁয়ের লোক শুনলি কিছু?

নি। হেঁঃ! কি যে বলো, কি যে কও!! লোক কোথায়? দ্যাবতা গো দ্যাবতা, নইলে ইস্ত্রীজন হয়ে বুধুইয়ের হাঁকে খাড়া থাকে! সেই একবার গে ঐ কি বলে—সেই যে গো—ধুত্তর মনেও আসে না ছাই, ক্ষেত্তর নগরের ওনাদের বাড়ী জগধাত্তির দেখেলাম, আর এই—একেবারে ঠিক এক গো, ঠিক এক। মা-ঠাকরুণ তানার পায়ে হাত দে কানতে লেগলো, আর আমি দেঁড়িয়ে ঠকঠকিয়ে কাঁপতে নেগলাম। দ্যাবতা গো দ্যাবতা, মনিষ্যি লয়।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

বৈষ্ণবীর ভিক্ষা।

গোলোক মিত্রের প্রাসাদতুল্য বাটীর অন্তঃপুর দ্বারে বেলা দ্বিপ্রহরে খঞ্জনী বাজাইয়া বড় মিঠা গলায় কে যেন গান ধরিয়াছে,—

"ভাব কি ভেবে পরাণ গেল।
যার নামে হরে কাল পদে মহাকাল
তার কেন কালো রূপ হ'লো।"

পাকা কাঁঠালের গন্ধে মাছির মত গান শুনিবার নেশার ঝোঁকে যে যেখানে যে অবস্থায় ছিল হুড়মুড় দুড়দুড় করিয়া ছুটিল। মুহূর্ত্তের মধ্যে এক পাল মেয়ে আসিয়া বৈষ্ণবীকে ঘিরিয়া ধরিল। কাহারও হাতে চুলের দড়ি ফিতা, কাহারও হাতে তাস, কাহারও হাতে আধ খানা সুপারী ও জাঁতি, কাহারও বা উলের কাঁটা। কেহ বলিল, "ও মা! বোষ্টমীর এত রূপ! দুগ্‌গোঠাকরুণের মত এ কেমনতর বোষ্টমী গা?" আর একজন তরুণী কাঁচের চুড়ি পরা হাত নাড়িয়া বলিল, "আহা, কি গলা! আমাদের দেশে সরকারদের বৌ জগন্নক্ষ্মী বেরিয়ে গে বাইজী হয়েছেল, তার মত মিঠে গলা। গাও গা গাও।" দুর্গা ঠাহর করিয়া দেখিয়া দেখিয়া বলিল, "ও জ্যাঠাই মা! এ সেই বে বাড়ীর বোষ্টমী যে!" এ কথা শুনিয়া চাঁপা নাক বাঁকাইয়া ঠোঁট উল্টাইয়া চলিয়া গেল। মতির মা সৌদামিনী বৈষ্ণবীর দুই হাত ধরিয়া তাহাকে বাটীর মধ্যে লইয়া যাইতে যাইতে বলিলেন, "তুমি কোথাকার বোষ্টমী গা? এমন

রাজরাণীর রূপ নিয়ে ভিক্ষে মেগে বেড়াচ্চ? এস মা এস, আমার ঘরে বসে গাইবে এস।” মেয়ের পাল সঙ্গে সঙ্গে গিয়া বৈষ্ণবীকে ঘিরিয়া উঠান আলো করিয়া বসিল, দুর্গা তাহার কোল ঘেঁসিয়া বসিয়া বলিল, “গাও।” এত কৌতুকোদ্দীপ্ত কালো চোখের তাড়নায়ও বৈষ্ণবীর কোন সঙ্কোচ বা লজ্জার ভাব নাই। সত্য সত্যই গায়িকার রূপ সে দীর্ঘ পুরন্ত দেহখানিতে আর ধরিতে ছিল না। তাহার বয়স আন্দাজ আঠার উনিশ, কপালে উল্কি, গলায় কণ্ঠী ও তুলসীর মালা। সে খঞ্জনী লইয়া গান ধরিল,—

ও গো কালোরূপ অনেক আছে
এ বড় আশ্চর্য্য কালো।
হৃদয় মাঝে রাখলে পরে
হৃদি-পদ্ম করে আলো॥
রূপে কালী নামে কালী
কাল হতে অধিক কালো,
ও রূপ যে দেখেচে সেই মজেছে—
অন্য রূপ লাগে না ভাল।
প্রসাদ বলে কুতুহলে
এমন মেয়ে কোথায় ছিল?
না দেখে নাম শুনে কাণে
মন গিয়া তায় লিপ্ত হ’লো।”

যে যেখানে আছে সকলের যেন ভাব লাগিয়া গিয়াছে, সকলেরই গালে হাত চোখ দু’টি গায়িকার মুখের দিকে। সে মধ্যাহ্নের স্তব্ধ আকাশ ডুবান ভরা স্বরের মধ্যে আর গায়িকার উদাস উর্দ্ধোৎক্ষিপ্ত চক্ষু দুটিতে প্রাণকাড়া রকমের কি একটা ছিল যাহাতে সকলকে বেহুঁস

করিয়া দিয়াছিল। গান থামিতেই এতক্ষণের কথার বাঁধ ভাঙ্গিয়া উচ্ছল তরঙ্গিণী ছুটিল। "বা বা! খাসা গান।" "ওঁলো অত গোল করিস নে, কথা শুনতে দে।" "ওমা! যাও যে, আর একটি গাবে না?" বৈষ্ণবী সত্য সত্যই খঞ্জনী গুটাইয়া উঠিয়া যায়, দুর্গা তাহার হাত ধরিয়া বসাইল, বলিল, "বোস্ ভাই বোস্, ভিক্ষে নিয়ে যাও।"

বৈ। না ভাই, ভিখ আমি নিই নে।

দু। ওমা! সে কি কথা? গান গাইলে যে?

বৈ। আমরা নামের ভিখ দিয়ে বেড়াই, ভিখ নিই নি গো।

সৌদা। তবে ভিখই আরও দিয়ে যাও; এক মুঠো দে' গেলে গুষ্টিসুদ্ধ খাব কি।

বৈষ্ণবী খঞ্জনী লইয়া কোন দিকে না চাহিয়া আবার গান ধরিল,—

"মদন সুন্দর গৌর কলেবর
দিব্য বাস পরিধান।
চাঁচর চিকুরে মালা মনোহরে
যেন দেখি পাঁচ বাণ।
চন্দন চর্চ্চিত শ্রীঅঙ্গ শোভিত
গলে দোলে বনমালা।
ঢুলিয়া পড়য়ে প্রেমে থির নহে
আনন্দে শচীর বালা॥
কাম শরাসন ভ্রূযুগ পত্তন
ভালে মলয়জ বিন্দু।
মুকুতা দশন শ্রীযুত বদন
প্রকৃতি করুণা সিন্ধু॥

সৌদা। না গো তোমার যাওয়া হবে না, অমন উঠি উঠি করো

না। সেই বের দিন থেকে ঐ মেয়েটা তোমার জন্যে যে রকম হেদিয়ে মরচে, যেতে হয় ওকেও ঝুলি খঞ্জনী হাতে দে নিয়ে যাও।

দুর্গা আসিয়া জেঠাইমার কাণে কাণে চুপি চুপি কি বলিল, তাহার পর পাড়ার মেয়ে পুঁটিকে কি বলিতে সে উঠিয়া গেল। বৈষ্ণবী আর গাহিবে না, অগত্যা গৃহিণী হাসি মুখে বিদায় দিয়া বলিলেন, "আচ্ছা, যেতে পার যাও।" বৈষ্ণবী গিয়া দেখিল অন্দরের দ্বার বাহির হইতে বন্ধ, সে অপ্রস্তুত হইয়া ফিরিয়া আসিতে মেয়েরা হাসির লহর তুলিয়া এ উহার গায়ে টলিয়া পড়িতে লাগিল। বৈষ্ণবী উঠানে উপু হইয়া বসিয়া সকলকে মনের সাধে গালি পাড়িল। কিন্তু তাহাতেও দ্বার কেহই খুলিয়া দেয় না, সে যে একটা কৃষ্ণের জীব বন্দিনী দশায় হুজুরে হাজির আছে সে বিষয়ে কাহারও যেন কোন সাড়ই নাই। গৃহিণী মেয়ের পালে বসিয়া হাসিমুখে পাকা চুল তোলাইতেছেন, যেন তাঁহাকে কেহ কস্মিনকালে কটু কথা মাত্র বলে নাই; যেন শুকসারী সংবাদের পালা হইতেছে, তাহাই শুনিতেছেন। গালিগুলা নিতান্ত ফাঁকা আওয়াজের মত ব্যর্থ গেল দেখিয়া বৈষ্ণবী পা ছড়াইয়া বসিয়া রহিল। গান গাহিতে বলিলে সহাস্যে বলিল, "মা, তোমরা সংসারী লোক, আপনার গরজেই দরজা খুলবে। আমার চাল না চুলো ঢেঁকি না কুলো, না হয় ততক্ষণ বসেই রইলাম।

সৌ। গরজ নেই তবে গাল দিলি যে?

বৈষ্ণবী মুখ টিপিয়া হাসিতে লাগিল। গালি পাড়া এ চতুরার কৌশল, যদি রাগ করিয়াই গৃহস্থেরা দূর করিয়া দেয়।

সৌ। তোমার নাম কি আগে বল।

বৈ। বোষ্টমীর কি নাম থাকে গা?

সৌ। থাক কোথা?

বৈ। মসীদবেড়ের জঙ্গলে।

দু। ওখানে না একটা পাগলা সাধু এয়েচে?

বৈষ্ণবী নিরুত্তরে উদ্দেশে প্রণাম করিল। বৈষ্ণবী এত লোকের মাঝে বুঝি কিছু বলিবে না ভাবিয়া দুর্গা তাহাকে গ্রেপ্তার করিয়া কিছু অন্তরালে লইয়া গিয়া বসিল, কৌতূহলী সৌদামিনীও উঠিয়া আসিলেন।

সৌ। তিনি কে গা?

বৈ। আমার গুরু।

দু। কেমনতর নোক গা?

বৈ। মানুষ হ'লে বলা যায়, দেবতার কথা কি বলবো ভাই?

দু। এখানে এলেন কেন?

বৈ। বলেন দৈব কাজ আছে।

দু। তুমি এলে কেন?

বৈ। নিয়ে এলেন তাই।

দু। কেন বলেন নি কি?

বৈ। বলেচেন, এখানে কপালের ভোগ খণ্ডাবে; অদেষ্টে অনেক দুঃখু আছে নাকি।

সৌ। দুঃখু খুঁজতে আসা?

বৈ। হাঁ ভাই, দুঃখ বিনা মন-কৃষ্ণ আপনার হয় না।

সৌ। সে কেমনতর সন্ন্যাসী গো?

বৈ। তোমার যারে হয় গো কৃপা অরূপ তার রূপের ছটা,
কোমরে কৌপীন জোটে না গায়ে ছাই আর মাথায় জটা।

দু। কোপনী জটা আছে নাকি?

বৈ। আছে বৈ কি।

দু। চিমটে ত্রিশূল?

বৈ। (সহাস্যে) তাও আছে।

দু। (আঁৎকিয়া উঠিয়া) ন্যাংটা?

বৈ। হ্যাঁ।

দুর্গা ভ্রূদুটা কপালে তুলিয়া থ হইয়া বলিল, "ওমা! বল কি?" খানিকটা থামিয়া ঢোঁক গিলিয়া আবার আস্তে আস্তে জিজ্ঞাসা করিল, "তার কাছে এমন সোমথ মেয়ে তুমি কেমন করে থাক গা?"

বৈ। তার কি জ্ঞান গোচর আছে? সে ছেলে মানষের মত। তার কাছে তুমিও থাকতে পার, দেখলে শুধু খোঁকার মত আদর করতে ইচ্ছে করে।

নব। ছেলে মানুষ, বুড়ো নয়?

বৈ। তা বুড়ো হলে কি হয়? তার কাছে থাকলে মনে থাকে না যে আমি মেয়ে আর সে পুরুষ।

সৌদামিনী নীরবে বিস্ফারিত নয়নে শুনিতেছিলেন, এখন গলায় আঁচল দিয়া গড় হইয়া ভক্তিবিহ্বল ভাবে বৈষ্ণবীকে প্রণাম করিলেন, বলিলেন, "মা! তুই সামান্যি মেয়ে নয়। আমাকে তোর সেই দেবতা দেখাবি মা?" দুর্গাও সোৎসাহে জলন্ত চক্ষে বলিয়া উঠিল, "হ্যাঁ হ্যাঁ, জ্যাঠাইমা, আমিও যাব।" বৈষ্ণবী গৃহিণীকে প্রণাম করিতে দেখিয়াও বাধা দেয় নাই, বসিয়া মৃদু মৃদু হাসিতেছিল, এখন আনমনে বলিল, "তেষ্টা পেলে সে সাগরে মানুষ আপনি যায়, মা। সে সাগর ছাড়া এ তেষ্টা জুড়োবার আর ঠাঁই কোথায়? কিন্তু এত কাছে থেকেও আমার ভাগ্যে সে জল জোটে নি।"

সৌদামিনী বড় বিপদে পড়িয়াছিলেন। এ যেন কেমনতর মেয়ে! দেখিলে অপলক হইয়া চক্ষু মেলিয়া সে অনবদ্য মাধুরী কেবলি দেখিতে

ইচ্ছা করে। মনে হয় যেন তাহাকে বুকের মধ্যে লইয়া যেমন করিয়া হোক্ তাহার সঙ্গে অভিন্ন হইয়া যাই। কিন্তু এই যে এত টানে, তবু কেমন যেন তফাতে রাখে ; ঐ তো ছেঁড়াটেনাপরা পায়ে এক হাঁটু ধূলা উল্কি-কপালে সামান্য মেয়ে, কিন্তু তবু মন্ত্র-গম্ভীর মধ্যে স্বর্ণমঞ্চারূঢ়া কি গরবিনী রাজরাণী হইয়াই বসিয়া আছে! সরলা সৌদামিনী ভক্তিবিগলিতা হইয়া কাদার তালটুকু হইয়া গিয়াছিলেন, বৈষ্ণবীর দুই পায়ে হাত দু'খানি রাখিয়া সজলনয়নে বলিলেন, "আমার ভিক্ষের বড় গরজ, মা ; আমার মত সংসারের পোক ছাড়া ভিখ দেবার এমন কাঙ্গাল আর কোথায় পাবি, বাছা?"

বৈ। পা ছাড়, মা ; এ শরীরে তাঁর রাখা আগুনের আঁচ পেয়ে গলেছ মা, তাই প্রণাম কত্তেও কিছু বলতে পারি নি। আমি খড়ের পুতুল গো খড় মাটীর পুতুল, যা' ভাবচো তা' নই।

সৌ। হোক খড়ের পুতুল, তাকেই তো পাটে বসিয়ে পিরতিমে করে মানুষ পূজো করে। বনে বাদাড়ে কোথায় যাবে, বাছা ; আমাদের এখানে থাক না।

বৈ। আমার সংসার ছেলে বেলায় ভেঙ্গে গেছে।

সৌ। কত লোকের সংসার ভাঙ্গে, আবার কি গড়ে না?

বৈষ্ণবী মাথা নাড়িল। সৌদামিনী অবুঝ নাছোড়বান্দা, তিনি কখন তাহার পায়ের ধূলা লইয়া কখন বুকে করিয়া চুমা খাইয়া আদর করিয়া বৈষ্ণবীকে আহার করাইলেন। অবশেষে তিনি কার্য্যান্তরে গেলে সুবিধা পাইয়া বৈষ্ণবী পলাইল। দুর্গা চিৎকার করিয়া বলিল, "ওকি! ওদিকে না, ও যে বারবাড়ী। দাদার সঙ্গে একদল বাবুরা রয়েচে গো।" বৈষ্ণবীর লজ্জা নাই, ভ্রূক্ষেপ নাই, গজেন্দ্রগমনে গিয়া ভেজান দ্বার ঠেলিয়া ভরা মজলিসে প্রবেশ

করিল। মাথায় কাপড় নাই! এমন যুবতী সুন্দরী মেয়ের আচম্‌কা আবির্ভাবে এই ইঙ্গবঙ্গ কালাপাহাড়ের দল তো ভেবাচেকা খাইয়া স্তম্ভিত। লরেন্স কার বিবাহের নিমন্ত্রণে আসিয়াছিল ;: সে স্প্রিংওয়ালা পুতুলের মত আধখাড়া হইয়া হ্যাণ্ড্ শেক করিবার প্রত্যাশায় হাত বাড়াইয়াই তদবস্থায় রহিয়া গেল। মতি তো থ! দুর্গামোহন লাহা পূর্ব্বে কি কথা প্রসঙ্গে আকাশ ফাটাইয়া হা হা করিয়া হাসিতেছিল, এখনও তাহার দাঁত তদ্বৎ খোলাই আছে। বুড়া তর্কালঙ্কার কেবল প্রকৃতিস্থ, তিনি কাছে আসিয়া থিয়েটারী ঢঙে মুখের কাছে হাত লইয়া বলিলেন, "তুই কে মা, কোন্ কুললক্ষ্মী রাজরাণীর আঁচল-ছেঁড়া ধন? মায়ের এক ফোঁটা চোখের জলে যে তোর লক্ষ বছরের তপস্যা ভেসে যাবে, মা।"

বৈষ্ণবীর এ সব দিকে আদৌ দৃষ্টি ছিল না, সে ঘরের মাঝামাঝি অবধি আসিয়া সৌৎসুক অভিনিবেশে মতিকে দেখিতেছিল, এখন বলিল, "হ্যাঁ গা, তুমিই কি মতিদা"?

ম। তুমি—এহুম্ আপনি—আমায় চেন নাকি?

বৈ। চিন্‌তুম। আমি এই পার-ঘাটার গাঁয়ে বামুনদের বৌ ছিলুম, তোমায় কতবার দেখিচি। কৈ বাড়ীর মধ্যে বৌ তো দেখলুম না?

এতক্ষণে কার সাহেব বসিয়া পড়িয়া বিড় বিড় করিয়া বলিলেন, "বাই জোভ্! এ ভিশন্ অব বিউটি! হুইজ শি?"

বৈ। সিদিনকে দেখলুম তুমি বিধবা-বের পাণ্ডা, আরও সব ঐ রকম অনাছিষ্টি কাণ্ড আছে নাকি? আমি অনেক কথা শুনিচি, তা' দেখ তোমরা বাবার কাছে চলো। তাঁর ইচ্ছে হ'লে ভ্রূভঙ্গে প্রলয় হতে পারে। এ রকম করে কিন্তু কিছু হবে না।

তর্কালঙ্কার ঠাকুরকে আর পায় কে, বৈষ্ণবীর পিঠ থাবড়াইয়া বলিয়া উঠিলেন, "সাবাস বেটী! ভায়া মতি এ দেখছ সাক্ষাৎ মা

দুগ্গো, খাঁড়া তলোয়ার সিঙ্গী অসুর সব লুকিয়ে আমাদের গতি করতে এয়েচেন। খাতায় নাম লিখে লাও, দলে ভর্ত্তি করে লাও, একবার মা এই ভুবনমোহিনী মুনিমনটলান রূপে আমাদের পক্ষে দাড়ালে মার ভ্রূভঙ্গে প্রলয় ঘটবে, সৃষ্টি ভেঙ্গে চুরে আবার নতুন করে গড়ে উঠবে। তুই কোথায় থাকিস্ মা? এ পতিত সন্তানদের কি দয়া করতে এলি? তোর নাম কি, মা? আহা, মায়ের আবার নামেই বা কি হবে।”

বৈষ্ণবী যেমন আসিয়াছিল তেমনি মধুর গতিতে বাহির হইয়া চলিয়া গেল। যখন সমস্ত গ্রাম ঘুরিয়া খেয়া পার হইবার জন্য শ্রান্তপদে সে নবীর ঘাটে আসিয়া বসিল, তখন সবে সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া ফুটফুটে জ্যোৎস্না উঠিয়াছে। চাঁদের আলো কি কুহকময় বস্তু, সে অনাবিল স্নিগ্ধ মধুরতার শান্তিটুকুর মধ্যে না জানি কতখানি সাধ আকাঙ্ক্ষা গুমরিয়া আছে যাহাতে মনটাকে লইয়া এমন মোচড় দেয়, এত হু হু করায়। গাছের কাঁপা পাতায় চকচকে জ্যোৎস্না, দ্বারকেশ্বরের তরঙ্গে তরঙ্গে সেই কাক-জ্যোৎস্নার কূলপ্লাবী রজতশোভা, আর ছায়া আলোয় ছম্‌ছমে্ বনের মধ্যে পিউ-কাঁহার আর্ত্ত স্বর। ভোগময়ী বসুধার ভোগ-পাগল ডাক। আর তাহার মাঝে এই নিঃসঙ্গ চিরবঞ্চিত তরুণ মন। বৈষ্ণবী ছোট্ট কালো দাগটির মত ওপারের নৌকার দিকে চাহিয়া গুণ গুণ করিয়া গাহিতেছিল,—

“আমি যার কাঙ্গালিনী সে পরশমণি
আমারি হৃদয়ে রাজে।
এ শ্রীঅঙ্গে সখি লুকায়েছে নাকি
অনুপরমাণু মাঝে।
তিয়াসু পরাণ ভরি কাণেকাণ
মধুগঙ্গা ছল ছল্,

মোর বুকভরা এ সুধা পসরা
পিইব কেমনে বল্।"

পিছনে খস্ করিয়া একটু শব্দ হইতে বৈষ্ণবী ফিরিয়া কি দেখিয়া দাড়াইয়া উঠিয়া আবার কাঁপিতে কাঁপিতে তখনি বসিয়া পড়িল। আয়ত চক্ষু বিস্ময়বিস্ফারিত করিয়া দাড়াইয়া দাড়াইয়া অতৃপ্ত মুগ্ধ দৃষ্টিতে যে দেখিতেছিল সে রাধু। রাধুর ইচ্ছা হইতেছিল কাঁধে হাত দিয়া ইহার আনত মুখখানি একবার উঠাইয়া দেখে এ কে। এ যে বড় চেনা-চেনা। কিন্তু কেমন সাহস হয় না। রাধুর কুষ্ঠিতে কিন্তু এত ইতস্ততঃ করা কস্মিন্‌কালে লেখে নাই। কিন্তু সে দিনকার বিষম লজ্জা—যাক্, সে কথা পরে বলিব।

রা। তোমায় তো চিনি ; তুমি কে গা?

বৈ। আমি বোষ্টমী।

গলার স্বর একটু কাঁপা কাঁপা, কবে যেন কোথায় বড় সুখের দিনে শোনা এ স্বর। সব চেয়ে পছন্দসই রাগিণীতে গাওয়া কোন্ প্রিয় গান দূর হইতে যত বিস্মৃত মধু বহিয়া আনিয়া যেমন হৃদয়-তন্ত্রীতে ঘা দেয়, গানের ভোলা পদগুলি মনে করিবার জন্য প্রাণ যেমন আনচান করে, এ যেন সেই রকম।

রা। হুঁ, তা'তো দেখচি। থাক কোথা?

বৈষ্ণবী অঙ্গুলিসঙ্কেতে ওপারের কালো বনভূমি দেখাইয়া দিল। রাধু হঠাৎ ঝুঁকিয়া তাহার মুখ দেখিয়া দেখিয়া বলিয়া উঠিল, "চিনেছি।" বৈষ্ণবীর আর লজ্জা সঙ্কোচ নাই, দাঁড়াইয়া উঠিয়া ব্যগ্র কণ্ঠে বড় উৎকণ্ঠায় ব্যতিব্যস্তভাবে বলিল, "তুমি চিনবে আমি জান্তুম, কিন্তু কারুখে বল্‌তে পাবে না, যদি বল, আমি যে পথে এয়েচি সেই পথে দেশান্তরী হয়ে চলে যাব।"

রা। যদি এতই ভয় তবে এলে কেন ?

বৈ। কেন যে এলুম তা তুমি বুঝবে না।

রা। আচ্ছা আচ্ছা, না বুঝি নাই বুঝলাম, আমি কাউকে বলবো না। কিন্তু বনে জঙ্গলে কেন থাকা ?

বৈ। তোমাদের ঘর সংসারের এই ত ছিরি, তার চেয়ে আমার বন জঙ্গল ঢের ভাল।

রা। থাক কি একা ?

বৈ। না, বাবা আছেন।

রাধু এ অঞ্চলের অনেক খবর রাখিত, বাবা যে মসীদবেড়ের পাগলা সাধু তাহা সে বুঝিল। ততক্ষণে খেয়াপারের নৌকা ঘাটে আসিয়া পড়িয়াছে। বৈষ্ণবী যায়, তখন রাধু তাড়াতাড়ি বলিল, "আমি কাল আসবো, আজ আমার সব কথা বলা আর শোনা হ'লো না।" বৈষ্ণবী একবার বারণ করিতে যাইতেছিল, আবার কি ভাবিয়া ধীর পদে গিয়া নৌকায় উঠিল।

নবম পরিচ্ছেদ।

তপোবনে—মিলনের সূত্র।

মিত্রদের ঘাটে দাঁড়াইয়া পূর্ব্বমুখে দেখিলে নদীর ওপারের হরিত স্নিগ্ধতায় চক্ষু জুড়াইয়া যায়। বনের পর বন, তাহার পর বন—উঠিয়া পড়িয়া স্তরে বিস্তরে প্রকৃতির ঢেউ খেলান আঁচলখানি ধূলার উপর রূপালী নদীর তটে তটে লুটান রহিয়াছে। আম-কাঁঠালের ঘোরাল ঢেউ, তাহার গায়ে বাঁশ নিম তেঁতুলের ফিকে সবুজ জালবুনানী। উপরে মেঘভাসা নীল আকাশ, আর তাহার গায়ে এখন তখন ঝাঁকে ঝাঁকে বক পায়রার সাদা সারি। বনের মধ্যে তাল পাকান ছায়া, ঠাণ্ডা হাওয়া; দিনের বেলায় শেয়াল ডাকে ত্যালাকুচা বনে দুই পায়ের ভরে বসিয়া কাঠবিড়ালী নির্ভয়ে ত্যালাকুচা ফল খায়। কুল কালকাসন্দা শেয়ালকাঁটার ঝোপের মাঝে অনেক পোড়ো দেওয়াল গম্বুজ গড়খাই শেওলা মাখিয়া পড়িয়া আছে। এখানে এক সময়ে একটা জনপদ ছিল, মহাকাল তাহাকে চিবাইয়া খাইয়া ঐটুকু ছিবড়া ফেলিয়া গিয়াছে। যে দিন মতির বিবাহ তাহার তিন মাস আগে এই বনে হঠাৎ লোকের ভিড় আরম্ভ হইয়াছিল। জনরব উঠিয়াছিল এখানে এক অদ্ভুত পাগলা সাধু আসিয়াছে, সে বাঘে চড়িয়া বেড়ায়, মা দুর্গা তাহার ভাঙ বাটিয়া দিয়া যায়, সে বম্ বম্ করিলে দ্বারকেশ্বরের জল ফাঁপিয়া ফুলিয়া পাড় ধসাইয়া উজান বহে। প্রথম প্রথম লোকে আসিয়া সাধু খুঁজিয়া পাইল না, তাহার এক চেলাকে নদীর কূলে পা ছড়াইয়া বসিয়া থাকিতে দেখিয়া ঘিরিয়া দাঁড়াইল। সে ঐ বৈষ্ণবী। লোকে তো অবাক্। এ

মেয়েটা আবার কে? এমন রূপ এত কাঁচা বয়স, এ জঙ্গলে পাগলা সাধুর কাছে করে কি? তাহারা সাধু দেখিতে চাহে শুনিয়া বৈষ্ণবী নিরুত্তরে মাথা নাড়িল,—দেখা হইবে না। লোকে ত চটিয়া খুন। রাগের মাথায় অনেকে মনের সুখে ধমক চমক করিল, কেহ কেহ অশিষ্ট ইঙ্গিতে যাহা বুঝাইল তাহা অকথ্য। মেয়েটার কিন্তু কিছুতেই ভ্রূক্ষেপ নাই, পা ছড়াইয়া তেমনি বসিয়া আছে! শেষটা দুই চার জন নাছোড়বান্দা মাতব্বরের পীড়া পীড়িতে বৈষ্ণবী উঠিয়া তাহাদের একজনকে লইয়া বনের মধ্যে ঢুকিল। এক জায়গায় একটা মাঠজোড়া প্রকাণ্ড বুড়ো অশত্থ গাছ, ঝুরি নামিয়া নামিয়া অনেকটা জমি ঘিরিয়া একটা ঘরের মত হইয়াছে। চারিদিকে ঝোপ ঝাড় কুলকরমচার বন। তাহার ভিতরে একটু পরিষ্কার করা জায়গায় সাধু আসীন,—ন্যাংটা, জটাজুট, সুন্দর গৌর মূর্ত্তি, কিন্তু মৌনী। সম্মুখে পঞ্চমুণ্ডীর আসনের উপর ত্রিশূল পোঁতা।

সকলের প্রতিনিধি হইয়া সাধু দেখিতে যে আসিয়াছিল, সে আরাম-বাগের মাড়োয়াড়ী মহাজন রতন চাঁদ। রতন চাঁদ সেই যে এখানে সাধুর আস্তানায় জুটিল, আর পেছু ছাড়িল না। রতনের অনেক টাকার কারবার, লোকটা বেজায় মোটা, প্রকাণ্ড ভুঁড়ি লইয়া গড়াইয়া গড়াইয়া চলে, চুলে-ভরা জোড়া ভ্রূর নীচে জলজ্বলে চোখ, মাথায় কাঁচা পাকা চুল প্রাণটি নিতান্ত সাদাসিদা; বয়স পঞ্চাশের কাছাকাছি, সন্তানাদি আদৌ নাই। সে নিত্যই আসিত আর ঘণ্টার পর ঘণ্টা সেই মৌনী তপোমগ্ন নিশ্চল মূর্ত্তির কাছে বসিয়া থাকিত। তাহার অর্থে নদী হইতে বনের দিকে শ্বেত পাথরের ঘাট উঠিল, বনের দুর্গম পথ পরিষ্কৃত হইল, উঁচু পাড়ের উপর একখানা ছাদওয়ালা গোল চবুতারাও হইল। রতন চাঁদ জুটিবার পর সাধু ও বৈষ্ণবীর খাওয়া পরার ভাবনা আর রহিল না;

ভাবনা আগেও বড় একটা ছিল না, তবে এখন অযাচিত ভাবে দুধ মাখন রাবড়ি ফলমূল মিষ্টান্ন প্রচুর পরিমাণে আসিতে লাগিল। বৈষ্ণবী তাহার কতক খাইত, কতক বনের শিয়াল বিড়াল ও পাখী পক্ষীকে বিলাইত এবং বাকি সমস্ত দিন ঘুরিয়া ঘুরিয়া চাঁড়াল বাগদী পাড়ার ন্যাংটা কাদামাখা ছেলেপুলের দলকে খাওয়াইয়া আসিত। টাকা কিন্তু অনেক কাঁদিয়া কাটিয়াও রতনচাঁদ সে মাগীকে লওয়াইতে পারে নাই।

মতির সমাজযজ্ঞনাশী ব্রহ্মদৈত্যের দলের তাড়াহুড়ায় গোপীনাথপুর সদা উদ্ব্যস্ত তটস্ত, সাধু দেখিবার অবসর সেখানকার লোকের নাই। দুই এক জন সারা জঙ্গল ঘুরিয়া সাধু দেখিতে না পাইয়া নাক সিঁটকাইয়া—“আরে তুমিও যেমন! কোথাকার একটা গেঁজেল বুজরুক লোটাধারী ফারী হবে আর কি” বলিয়া ফিরিয়া আসিল, দেখিতে সে যে পায় নাই তাহা না বলিয়া হুবহু ঐ কথাই গ্রামে রটাইয়া দিল। সুন্দরী বৈষ্ণবীর সংবাদ পাইয়া রাধুর দলের দুই চার জন ফচকে ছোঁড়া বন বেড়াইতে গিয়াছিল বটে, তাহারাও ফিরিয়া আসিয়া গালি পাড়িল বই দুইটা ভাল কথা বলিল না। শেষে “চ দেখি কেমন সে বৈষ্ণবী” বলিয়া একদিন বেশ করিয়া মদ টানিয়া চক্ষু দুইটা জবা ফুলের মত, হাস উচ্চ ও গতি টলমলে করিয়া লইয়া রাধু নিবারণ নিধি প্রভৃতি কয়েকজন বাছা বাছা ইয়ার মিলিয়া মসীদবেড়ের বনে গিয়া চড়াও হইল। তাহাদের “মৌতো গোরী’ হল্লায় বনের পাখী নীড় ছাড়িল, খরগোস কাঠবেড়ালী খেঁকশেয়াল গিয়া ঝোপে ঝাড়ে লুকাইল, তৃণভোজী নিরীহ গাই বলদ ভয়ের চোটে ঊর্দ্ধলাঙ্গুল ফুলকোচোখো হইয়া পগার ডিঙ্গাইল, অর্থাৎ পগার ছিল না তাই, নহিলে ডিঙ্গাইত। দলছাড়া হইয়া যেখানে গিয়া একা রাধু বৈষ্ণবীর দেখা পাইল সেখানটা বনের ছায়ায় সেঁৎসেঁতে ঘোর-ঘোর আর বাঁশ পাতার সোঁ সোঁ শব্দে সে নির্জ্জনতা বড় গম্ভীর

করিয়া তুলিয়াছে। রাধুর নেশার চোখে তখন দুনিয়াটা ঘোলা, আকাশ পাতাল ও পায়ের নীচে পৃথিবী ঘুরিতেছে, আর সম্মুখে এই পাগলকরা ভুবনমোহিনী রূপ। রাধু দুই হাত বাড়াইয়া তাহাকে জড়াইয়া ধরিতে গেল। বৈষ্ণবী একটা মোটা আমের ডাল ভাঙ্গিয়া লইয়াছিল, তাহা ঘুরাইয়া রাধুর কপালে মারিল! রাগে তাহার নাসারন্ধ্র স্ফিত, চক্ষু রাঙ্গা, গ্রীবা এক অভিনব তেজস্বিতায় বঙ্কিম। রাধু টলিয়া পড়িয়া গিয়া চৈতন্য হারাইল।

মুহূর্ত্তেকে সে রণরঙ্গিনী রূপ কোথায় গেল, তেজ অভিমান ক্রোধ গিয়া করুণায় চক্ষু ভরিয়া আসিল, বৈষ্ণবী ভূপতিত দেহের দিকে পশ্চাৎ করিয়া বসিয়া মুখে অঞ্চল ঢাকিয়া কাঁদিয়া ফেলিল। সেদিন ইয়ারের দল রাধুর অচেতন দেহ ধরাধরি করিয়া আড্ডায় লইয়া যাইবার পর এ পথ আর বড় একটা কেহ মাড়ায় নাই। এই ঘটনা স্মরণ করিয়া সেদিন নবীর ঘাটে রাধুর চক্ষে অত লজ্জা ব্যবহারে অত ইতস্ততঃ ভাব ছিল, তাহার মাতাল পাপ জীবনে এই প্রথম তাহার আত্মগ্লানী।

যে দিন বৈষ্ণবী আসিয়া গান গাহিয়া কৃষ্ণপ্রিয়ার মন ইহজন্মের মত স্নেহ-বন্ধনে বাঁধিয়া গেল, তাহার তিন দিন পরে জেঠাই দেওর-ঝিতে পরামর্শ করিয়া বুড়া তর্কালঙ্কার ঠাকুরকে গ্রেপ্তার করিয়া সঙ্গে লইয়া দু'জনে মসীদবেড়ের বনে আসিয়া উপস্থিত হইল। তখন বেলা দুইটা, বনের মধ্যে শুধু পাখীর ডাক, গা জুড়ান ছায়া আর নিছাঁক ভরাট শান্তির ঘুম। সিঁড়ির গোটা পঞ্চাশ ধাপ পাড়ের উপর উঠিয়া গিয়াছে। নীচে সেইখানে রাধু চোরের মত ইতস্ততঃ চাহিতে চাহিতে তাহার চকচকে বার্ণিস্ করা জুতাজোড়াটা কচুবনের মধ্যে লুকাইতে ছিল। তর্কালঙ্কার হাঁক দিয়া বলিলেন, "কি হে, রাধু যে! কচুবনে কি কচ্চ? বেড়ালের মত মাটি চাপা দিচ্চ না কি?"

অপ্রস্তুত রাধু খানিকটা ফ্যাল্ ফ্যাল্ করিয়া চাহিয়া থাকিয়া মাথা চুলকাইল; ভাবটা এই যে এ আপদগুলা আবার কোথা হইতে আসিয়া জুটিল? প্রতিশ্রুতি দিয়া এ তিন দিন তাহার আসা ঘটে নাই। রাধুর মনে এতগুলা বিপরীত ভাবের সংগ্রাম এই প্রথম,—মন আসিতে ব্যাকুল অথচ পা উঠে না; চক্ষু যাহাকে দেখিতে চায়, বুদ্ধি বিচার তাহার সান্নিধ্য ভাবিয়া ভয়ে সঙ্কোচে পালাই পালাই করে। বুড়ার সঙ্গে দুই জন অবগুণ্ঠিতা স্ত্রীলোক! ফতো বাবু রাধুর হাতটা তাহার এক রকম অজ্ঞাতেই মাথার তেড়ি জুতসই করিয়া কাঁধের শালটা গুছাইয়া দিল। সে সহাস্যে বলিল, "না না, এই জুতোটা সামলে রাখছি।"

তর্কা। কেন বল দিকিন্, এখানে জুতোচোর আছে না কি?

রা। এই দেখুন, আপনার যেমন কথা!

তর্কা। শুনলুম নাকি অষ্টসিদ্ধিওয়ালা সাধু; মেয়েটাকে পেলে কোথা হ্যা? যেমন রূপ তেমনি পাণ্ডিত্য, বোষ্টমী ন্যাড়া নেড়ির দলে ও রকম অসাধারণ মেয়ে কোথা থেকে জন্মাল? তুমি বোষ্টমীকে দেখেচ? কথাবার্ত্তা কয়ে দেখেছ? তার গান শুনেছ? আহা! খাসা গায়, যেমন মিঠে গলা তেমনি স্বর লয় তালের সমন্বয়! মতির বিয়ের রেতে নাকি তোমার আড্ডায় খবর দিতে সেই প্রথম আসে?

রা। এই—এ—ইয়ে—হ্যাঁ।

তর্কা। বেশ বেশ, চলো, দেখে আসা যাক্।

কথা হইতে হইতে সকলে চত্বরে আসিয়া পড়িলেন। সেইখানে আজ সাধু আসীন; পার্শ্বে কমণ্ডলু, একজোড়া খড়ম, পিঁড়ির উপর থালে এক থাল মিষ্টান্ন। থামের গায়ে একটা বীণা ঝুলিতেছে। সাধুর সর্ব্বাঙ্গে ছাই, নিরভিমান শান্ত বদনে হাস্য, আয়ত চক্ষের দৃষ্টি কিছু

বিহ্বল সদা অন্তর্মুখতা বশতঃ কিছু নিস্পন্দ নির্নিমেষ। মাথা ক্রমাগতঃ অল্প অল্প দুলিতেছে, যেন কি নেশার মগ্ন সুখে ঢুলুঁ ঢুলু। তাঁহার সম্মুখে রতনচাঁদ বসিয়া তুলসী-দাসী রামায়ণ পড়িতেছে। আর সেই বৈষ্ণবী পায়ের উপর লুটাইয়া পড়িয়া ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতেছে। তাহার কালো চুলের ঢেউ তাহার পিঠ ভাসাইয়া সাধুর চরণ ঢাকিয়া মৃগচর্ম্মের আসনে ইতস্ততঃ লুটাইতেছে। সকলে তো অবাক তটস্থ! এ আবার কি কাণ্ড! মেয়েটা কাঁদে কেন? কোন রকমে প্রণাম করিয়া যে যেখানে পারিল বসিয়া পড়িল। সকলের মনে ঐ এক কথা, এমন করিয়া মেয়েটা কাঁদে কেন? রাধু সামনে ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে, তাহার চক্ষে ক্ষুধিত ব্যাঘ্রের দৃষ্টি। পাঠ চলিতেছিল,—

"ডমরু-তরু বিশাল তব মায়া।
ফল ব্রহ্মাণ্ড অনেক নিকায়া॥
জীব চরাচর জন্তু সমানা।
ভিতর বসহিঁ ন জানহিঁ আনা॥
তে ফল ভক্ষক কঠিন করালা।
তব ডর ডরত সদা সোউ কালা॥
তে তুমহু সকল লোকপতি সাঁঈ।
পূজেহুঁ মোহি মনুজ কি নাই॥
ইহ বর মাগৌঁ কৃপানিকেতা।
বসহুঁ হৃদয় সিয়া অনুজ সমেতা॥
অবিরলি ভকতি বিরতি সতসঙ্গা।
চরণ সরোরুহ প্রীতি অভঙ্গা॥
যদ্যপি ব্রহ্মণ্ড অখণ্ড অনন্তা।
অনুভবগম্য ভজহিঁ যে হি সন্তা॥

অস তব রূপ বখানৌ জানৌ।
ফিরি ফিরি সগুণ ব্রহ্ম রতি মানৌ॥

পাঠের মধ্যে একটু ফাঁক পাইয়া নাছোড়বান্দা তর্কালঙ্কার ঠাকুর গলাটা যথাসাধ্য মিঠে করিয়া ডাকিলেন, "মা, আমরা যে তোমাদের দর্শন করতে এলাম।" বিরক্ত রতনচাঁদ গোঁফ দাড়ী বাকাইয়া হাত তুলিয়া নিষেধ করিল। সে স্বরে বৈষ্ণবী চক্ষু মুছিয়া উঠিয়া বসিল, সাধুর পা কিন্তু ছাড়িল না।

তর্কা। থামাও তোমার কচকচি। আহা! সত্যি বলেছিলি, মা, এ দেবতাই বটে। তা' কথা বলেন না, কিছু জিজ্ঞেস করতেম।

বৈ। বাবা মৌনী, শেষ রাত্রে অল্পক্ষণ কথা বলেন।

তর্কা। এ তো দেখছি ত্যাগের মূর্ত্তি! কর্ম্মের কি হবে মা? কর্ম্ম বিনা যে এমন সোণার দেশ শ্মশান হ'য়ে গেল। তোরা সব বনে থাকবি, তবে ত্রিশ কোটী অভাগা সন্তানের গতি কে করবে বল দেখি? কর্ম্ম যে ভুলে গেলি, মা?

বৈষ্ণবী এতক্ষণে সোজা হইয়া বসিয়াছিল, এখন ডাগর কালো চক্ষু তুলিয়া বলিল, "কাজ কে করবে? লোক কই?

তর্কা। কেন, মা? আমরা।

বৈ। কাণার বড় দুর্ভোগ, বাবা; সে বড় জোর হাতড়ে হাতড়ে মেরে কেটে এক ঘটি জল গড়িয়ে নিজে খেতে পারে, দিন দুনিয়ার তেষ্টা সে মেটাবে কি করে?

তর্কা। কেন, মা? ইউরোপে এই তো এত লোক কাজ কচ্ছে। লুথার গ্যারিবল্ডি ওয়াসিংটন লিঙ্কল্‌ন্‌ এদের কর্ম্ম কি কর্ম্ম নয়? ইউরোপ আজ সসাগরা পৃথিবীর অধীশ্বর, জ্ঞান বিজ্ঞানের কেন্দ্র, শিল্প কলার পীঠভূমি সভ্যতার আধার। আর আমরা কোথায়?

বৈ। আমি মুখ্খু মানুষ, তাদের কথা জানি নে। (সাধুর দিকে প্রেমবিগলিত বিহ্বলদৃষ্টে চাহিয়া) এই তো পথ, এর জন্যে যে জাগা লোক চাই। শুধু এইখানে দুঃখু শোক মৃত্যু হার মেনেছে।

তর্কা। কর্ম্ম বিনে যে বাঁচবি নে, মা। চাষার পেটে অন্ন নেই, শরীরে বল নেই, মনে সুখ নেই, ধর্ম্ম করবে কে বল্ দেখি?

বৈ। ভাল আর মন্দের কর্ম্ম দুইই গাঁজা, আমরা এই গাঁজার গাঁজা-খোর। কাজের নেশায় বড় দুঃখু, বাবা। বরঞ্চ খারাপ কাজে কম লোক মাতে, খারাপ বলে তা'তে জ্ঞান থাকায় দশ জনের চেষ্টায় সেটা বেশি বাড়তে পায় না। কিন্তু ভালর নেশায় কত বড় বড় জাত খুন-চেপে শয়তানের রূপ ধরে, ধর্ম্মের দেশের নামে নরহত্যা রাহাজানী লুটতরাজ করে। ধর্ম্ম এমন সর্ব্বপাবন জিনিস, তা'কেই যে জাত নিজের বলে পুঁটলি বেঁধেচে, সেই জাত এক হাতে তলোয়ার অন্য হাতে ধর্ম্ম বা জন-হিত নিয়ে ভাইএর গলা কাটতে বেরিয়েচে। তিল তিল করে জ্বলে পুড়ে মরাই কি বাঁচা, বাবা? গলা ফাটা তেষ্টায় সেই তেষ্টা বাড়াতে চিটে গুড় খেয়ে বেড়ানই কি বাঁচন? মানুষ জুড়োবে না?

এ এক অদ্ভুত দৃশ্য। বিশ বৎসরের মেয়ে— একটা ছেঁড়া সাড়ী পরা সামান্য বাঙ্গালীর মেয়ের মুখে জ্ঞানের কথা! আশ্চর্য্যের বিষয়, কত শতাব্দীর পর্দ্দা মুর্খতা ও পদদলনের পরে নারীর বিদ্যা আমাদের দেশে বিস্ময়ের বস্তু হইয়াছে, নহিলে এক দিন হিন্দুর ঘরে ঘরে এই ছিল। রাধিকা হতভম্ব, তর্কালঙ্কার নির্ব্বাক। তিনি শেষে বলিলেন, "তুই এত জ্ঞান কোথায় পেলি মা?"

বৈষ্ণবী বিহ্বল সুখে সাধুর দিকে চাহিল।

তর্কা। মা, তবে সংসারে কর্ম্ম করে কেন? ভগবানের এ রজো-ময় সংসার কেন হল?

বৈ। রাজসিকের জন্যে কর্ম্মের কুম্ভীপাক, একটা প্রাণান্তক টানা-পোড়েনে নাস্তানাবুদ হয়ে মুখ দে গাঁজা না ভাঙ্গলে তার যে সুখ হয় না। এই কাঁদন নাচন সব তার সুখের লেগে খেলা। দেশে দেশে কত কথা কত পথ আছে, আমাদের বেদান্ত আর নিষ্কাম কর্ম্মের ওপরে আর কিছু নেই।

অনুপম রূপলাবণ্যময়ী সেই মানবী মূর্ত্তি, পরমার্থভাবে তন্ময় নির্ব্বাক যোগী, নিবাত শান্ত গোধূলিধূসর তপোবন ;—ঝড়ে মাতান সাগর যেমন মলয়ানিলের করস্পর্শে জ্যোৎস্নার মধু-চুম্বনে নীল কাচখানির মত ঠাণ্ডা হইয়া যায়, তর্কালঙ্কার ও সৌদামিনীর মন দুইটী তেমনি হইয়া গিয়াছিল। দুর্গা কিছু বুঝিতে পারে নাই, হাঁ করিয়া সব শুনিতেছিল দেখিতেছিল। আর রাধুর মনে কেবল কুণ্ডলে কুণ্ডলে ধোঁয়া, পাগল প্রবৃত্তির অগ্নি, শুধু দ্বিধা সন্দেহ ও ব্যর্থ আকুলতা। তর্কালঙ্কারের অনুরোধে বৈষ্ণবী খঞ্জনী লইয়া গান শুনাইল, গানের দুই এক চরণ শুনিয়া হঠাৎ বীণা পাড়িয়া লইয়া রাধু বাজাইতে লাগিল। বৈষ্ণবীর গানও চলিতেছিল।

পাখী যখন শাখা ত্যাগ করিয়া আকাশে উড়ে, তখন প্রথম প্রথম কত নাচিয়া ঘুরিয়া উঠিয়া পড়িয়া চলে, তাহার পর নিথর ব্যোমে অঙ্গ ঢালিয়া দিয়া অবাধ আনন্দে মেঘের নীল কোলে কোলে ডুব দিয়া যাইতে থাকে। কাঁপা বাধ বাধ গলায় সে মধুর রাগ– তেমনি রহিয়া রহিয়া সপ্তকে সপ্তকে উঠিয়া পড়িয়া মত্ত পূর্ণতার লহরীতে আকাশ ভরিয়া ডুবাইয়া দিল।

যেমন এ মেয়ের গান, রাধুর বীণাও তেমনি সজীব তাললয়মাখা ও প্রাণস্পর্শী। সর্ব্বস্ব খোয়াইয়া রাধু চূড়ান্ত করিয়া শিখিয়াছিল এই এক বিদ্যা। গীত থামিল বটে, কিন্তু সকলের মনের কূলে কূলে বহুক্ষণ ধরিয়া বড় মধুর প্রেমমত্তভাবে বাজিতে লাগিল। সবাই বিদায় লইল, রাধু গেল না, সঙ্গে সঙ্গে গিয়া সকলকে বিদায় দিয়া চলিয়া আসিতে বৈষ্ণবী

পশ্চাতে চাহিয়া দেখিল রাধু ফিরিয়া আসিয়াছে। উভয়ে নিরুত্তরে গিয়া এক গাছের তলায় বসিল। এ বড় বিপদ! কথা কে আগে আরম্ভ করিবে? শেষে রাধু জিজ্ঞাসা করিল, "জগদম্বা পিসি কোথায়?"

বৈ। (ধরা গলায়) মা মথুরায় মারা গেছেন।

রা। পিসে মশাই?

বৈ। জানি নে। বাবা জানেন।

রা। বাবা কে?

বৈ। ঠাকুরের গুরু; হরিদ্বারে এঁর নাম বাবা অলখনাথ।

রা। তুমি এত দিন কোথায় ছিলে?

বৈ। মথুরায় ঠাকুরের কাছে। তিনি লেখাপড়া শিখিয়েচেন, ভেক দিয়েচেন।

রা। ভেক নিলে যে?

বৈ। কোন বাঁধন পেছুটান নেই, বেশ আছি।

রা। মথুরা ছেড়ে এর সঙ্গে এলে কেন?

রাধুর সন্দিগ্ধ জেরায় বৈষ্ণবী ক্ষণেক নিরুত্তরে কি ভাবিল, তাহার পর বলিল, "সে অনেক কথা, সব অদেষ্টের ফের। আমার কথা যাক্, তুমি এমন হলে কেন?" রাধু কুণ্ঠিত হইয়া বলিল, "কেমন?"

বৈ। তাও কি এ পোড়ামুখে বলতে হবে? ছি! আমরা দুর্ব্বল মেয়ে মানুষ। তুমি পুরুষ, শক্তির আধার, সকল রকমে স্বাধীন, কি না কর্‌তে পার। এমন জীবনটা এই করে ফেলেচ!

রা। সব অদৃষ্টের ফের, তুমিই তো বললে। তুমিও যেমন, কিসের কি; দু'দণ্ডের জীবন, যেমন করে হোক কেটে যাক্।

বৈ। না না, তুমি অনেক বড়, কেবল তোমার মন ঘুমিয়ে রয়েছে। অমন কথা মুখে এনো না।

রা। ক্ষতিই বা কি? আমার বয়ে যাওয়ায় কাঁদবার কেউ তো নেই। (ক্ষণেক চুপ করিয়া) আচ্ছা, কিছু কি আছে?

বৈ। কি?

রা। এই ভগবান টগবান?

বৈ। একটা কিছু আছে বৈ কি।

রা। কেমন করে জান্‌লে?

বৈষ্ণবী হাসিতে লাগিল, বলিল, "তুমি কি নেই, এ জগৎ সংসার কি চোখের সামনে নেই?"

রা। তা' তো আছে।

বৈ। তবে এ সন্দেহ জিজ্ঞেসাবাদ কেন? আছে ত নিজেই মানচো।

রা। এই কি সব?

বৈ। সব কে জানে, ভাই? ঐটুকুতেই প্রাণ ভরে আছে।

রা। হেঃ! আমার বিশ্বাস হয় না।

বৈ। যাক্ গে। তুমি ও-পথ ছাড়।

রাধু চুপ করিয়া ক্ষাণিকটা মাথা চুলকাইল, তাহার পর হঠাৎ সম্মুখে দুই হাত বাড়াইয়া বলিল, "কিসের জন্যে? কিন্তু তুমি জান তুমি বললে তাও পারি।"

বৈ। ছি! ঐ কি ছাড়া? ওতো আরও ডোবা।

রা। তবে উত্তর দাও কিসের সুখে আমি এত মজা সব ছাড়বো।

বৈ। সুখের জন্যেই ছাড়তে বলছি।

রা। সুখ কই?

বৈ। সব ত তোমারই, চাইলেই পাও। একবার আনন্দের ব্যাপারী হয়ে বোসো না, তখন দেখো কিই না তুমি পাবে।

দশম পরিচ্ছেদ।

রাধুর পথের কাঁটা।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি মতির সহিত রাধিকার গ্রামসম্পর্কে আলাপমাত্র ছিল, কখনও সৌহার্দ্দ হয় নাই। মতি গরীব চাষী চাঁড়ালকে ঔষধ বিলাইত, ঘরে ঘরে গিয়া গায়ে পড়িয়া রোগীর সেবা করিত, বখা তেড়িকাটা আড্ডাধারী ছেলে দেখিলে পথে ঘাটে ধরিয়া সদুপদেশে তাহাকে বিব্রত করিয়া তুলিত। কাঁধে একখানা চাদর ফেলিয়া চটি পায়ে ঝগড়া বিবাদ মিটাইয়া শ্রাদ্ধ ও বিয়ে বাড়ীর ফাই ফরমাস খাটিয়া ফিরিত। তা' ছাড়া সাধু ফকির বা পণ্ডিত পাইলে তাহাদের খোঁচা মারিবার সুখে আহার নিদ্রা ভুলিয়া যাইত। এমন বদরাগী হুজুগে কুতার্কিক এ অঞ্চলে আর দ্বিতীয় ছিল না এবং ঝোঁকের মাথায় অকার্য্য কুকার্য্য করিয়া ফেলার বাইও এ গাঁয়ে আর কাহারও ছিল না।

মতি ভাবিয়াছিল রাধুকে জীবন-কর্ম্মের সঙ্গী করিয়া লইবে। নেশা ভাঙ আড্ডা লাঠিবাজী? তা' হউক পটাইয়া সটাইয়া ও গুলা কি আর ছাড়ান যাইবে না? একটা মানুষকে ভালই না করিতে পারি তবে এত বড় কাজ লইব কি করিয়া? এই রকম পাঁচ সাত ভাবিয়া মতি যে ব্যর্থ চেষ্টা করিল তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। রাধুর মত পাষণ্ডী কালাপাহাড় তরাইতে মতির সাধ্যে কুলাইল না, অগত্যা সে তর্কালঙ্কারকে সহায় করিয়া একাই খাটিয়া যাইতে লাগিল। মতির বিবাহের ঠিক পরেই অতিবৃষ্টির দরুণ সে বৎসর বর্দ্ধমান ও জাহানাবাদে বিস্তর ফসল নষ্ট

হইল, ফলে অকাল পড়িল। মতি কোমর বাঁধিয়া দুর্ভিক্ষ-পীড়িতের আহার যোগাইতে লাগিয়া গেল। কিন্তু যত টাকায় দুর্ভিক্ষ দূর হয় মতির অত টাকা কোথায়? মতির দল কিছু পিলে-চমকান রকমের সমাজ-সংস্কার করিয়া গোঁড়া গোপীনাথপুরের টিকিতিলকসর্ব্বস্ব বুদ্ধির চক্ষুতে জ্ঞানাঞ্জন শলাকা প্রয়োগ করিতে অন্ধি সন্ধি খুঁজিতেছিল। নিজ অর্থে ধর্ম্মগোলা খুলিয়া মতি চাষীর দুর্বৎসরের আহার ও বীজ ধান ধারে যোগাইতে লাগিল।

এদিকে মসীদবেড়ের বন হইতে ফিরিয়া রাধিকা হঠাৎ আড্ডা মদ কুসঙ্গী লাঠিবাজী ছাড়িয়া দিল, কেবল মথুরার দল বড় উত্ত্যক্ত করিয়া তুলিলে এক আধবার মাত্র ফোঁস্ করিয়া আত্মরক্ষা করিতে লাগিল। কিন্তু সমস্ত দিন শুধু তামাক টানিয়া হাই তুলিয়া তুড়ি দিয়া হাবিজাবি ভাবিয়া দিন কাটান ভার। নয় ভাল নয় মন্দ একটা কিছু উপসর্গ না থাকিলে এ রকম ব্যস্ত-বাগীশ লোক শীঘ্রই অতিষ্ঠ হইয়া উঠে। ওদিকে অপযশও আবার হইতে বিলম্ব হয় না, কিন্তু ঘুচিতে অনেক কাল লাগে। রাধুকে রাতারাতি শুধরাইতে দেখিয়া লোকে মতির খোসনাম করিতে লাগিল, অমন দেব-মানবের সঙ্গ, তাই এমন পাষণ্ড তরিল। বিশেষ মতি জমিদার, তাহার খোসনাম করার লোক অনেক। মতির যশোগান শুনিয়া শুনিয়া রাধুর কান ঝালাপালা; লোকে যাহা চায় রাধুর শরীরে সে গুণ নাই, আছে কিনা মতিতে! এটা সহ্য আর যে করিতে পারে করুক, রাধু পারিল না।

কি ভাবিয়া এক দিন সে হঠাৎ মতির বাটী উপস্থিত। ধপাস করিয়া বসিয়া পড়িয়া মতির উরুতে এক বিরাশি শিক্কা-দরের থাপ্পড় কশাইয়া দিয়া বলিল, "মতিদা এই ঠিক হয়েচে, বস্ আমায় তোমার দোকানে নাও; আমায় না নিয়ে তোমরা এ অঞ্চলে কি করবে?" মতি তো

অবাক্, বিস্ময়ে উৎসাহের চোটে হঠাৎ তাহার হাঁপ ধরিবার জোগাড়। সে তাড়াতাড়ি জিজ্ঞাসা করিল. "য়্যাঁ, সে কি ?"

রা। হ্যাঁ, আমি টাকা দেব। কত চাই ?

ম। বল কি ?

রা। আরে মুস্কিল, কথাটা গিলতেই পাচ্ছ না যে !

ম। আর—ঐ—সে সব ?

রা। ঐ ল্যাও, যে সুন্দুরীর কাছে যাও, ঐ এক কথা !

ম। আরে না না—

রা। না না কি ? (চিৎকার করিয়া) তোমরা ভাব তোমরা সব এক একটি ইন্দির চন্দর বরুণ; আর আমরা গুয়োর ইয়েরা নারকী পাতকী, ভাল কাজ কত্তে গেলে আমাদের হাত বেঁকে যায়, জীবের আড় ভাঙ্গে না। বলি মোথরো গুয়োর ইয়ে ভীমগড়ে যখন চাষার মান ইজ্জৎ স্ত্রীলোকের ধম্ম নিচ্ছিল, তখন কিন্তু ইন্দির চন্দরদের নাকের ডগাটি অবধি দেখা যায় নি; এই রেধোর বাঁশ গাছাই কাজ দিয়েছিল কিন্তু।

ম। আরে থাম থাম, অত চটো কেন ? তুমি এসেছ দাদা ভাল সময়ে, ইদিকে আমার পুঁজিতে আর কুলোয় না।

রা। হেঁঃ। কত চাই ?

ম। তার এখন কি ? আগে কাজটা বোঝ, খাতা পত্তর দেখাই। কাজটা কিন্তু যা' হচ্ছে, এই দেখ না—

রা। ও সব বুঝিনে। সোজাসুজি বলে ফেল চাই কত।

ম। এই শোন, পাগলের কথা একবার শোন। একটা বড় কাজের ভার নিচ্ছ, আগে ব্যাপারখানা তলিয়ে বোঝো, কতখানি—

রা। উহুঁ ! আমি অত মার-প্যাঁচ বুঝলে ত। তুমি খাটাবে,

আমি খাটব ; তুমি চাইবে, আমি টাকা গুনবো। বাস্। পাঁচ হাজার অবধি দেওয়া রইল। কি বলবো দাদা? গুখুরী করে অনেক টাকা ফুঁকে ফেলেছি, (মাথা নাড়িতে নাড়িতে) আরে রাম রাম. এমন বিষও খায়।

মতি কিছুতেই বুঝিয়া উঠিতে পারিল না যে এত বড় পাষণ্ডীর মতি গতি এমন করিয়া ফিরাইল কে! রাধু মৎলব করিয়া আসিয়াছিল যে চাল টাল মারিয়া টাকা কবলাইয়া মতির হাতের কাজটা নিজের হাতে লইবে, কিন্তু হিসাব কিতাবে তাহার মাথা খেলে না, তাহার উপর আবার প্রাণটা বেজায় উদার। কাজেই ফলে মার প্যাঁচ না করিয়া সেই-ই মতির নিকট আত্মসমর্পণ করিয়া বসিল। মতির কথায় রাধিকা মাণিক পোদ্দারকে জুটাইয়া মতির দোকান হইতে চাষাকে ধান যোগাইতে লাগিল। তাহাদের অজস্র ব্যয়ে চাষীলোকের অনেক আনুকূল্য হইল, সুদখোর মহাজনদের ব্যবসা মাটি হওয়ায় তাহারা গিয়া মথুরার দলে নাম লিখাইয়া রাধুর শত্রুকূল বৃদ্ধি করিল। শেষে দুর্ভিক্ষ কাটিল, বর্দ্ধমান জাহানাবাদ বনবিষ্ণুপুরে রাধিকার কৃপায় সকলে পেট ভরিয়া দু' বেলা অন্ন পাইয়া সুজন্মার দিন ধান কাটিয়া বাঁচিয়া গেল। তবে মতির দয়ার প্রাণ সকলে চিনিত, অনেক দুষ্টপ্রকৃতির লোক দোকানের ঋণ পরিশোধ করিল না। মাণিকের কথায় ও বুদ্ধিতে কাজ হইয়াছিল বলিয়া বন্ধকী গহনা ও তৈজস পত্রের দামে আসল টাকা উঠিয়া আসিল বটে, কিন্তু ব্যবসা হিসাবে লাভ আদৌ হইল না।

রাধু বলিল. "কি, মতিদা?' এ রাস্কেলরা তো বেইমান, যে করে পারি আদায় করে নি?" মতি জিভ কাটিয়া উত্তর দিল, "সে কি? মোকদ্দমা! পীড়ন!! কাজ নেই ভাই, শেষটা কি কাবুলী জানোয়ারের মত লাঠির মুখে লাভের টাকা আদায় কত্তে হবে? তোমার কত নাম

হয়েচে, এই কি কম লাভ? দোকান না চলে, তুলে দাও, আমাদের কাজ তো হয়ে গেছে।” অগত্যা ধর্ম্মগোলা শিঙা ফুঁকিল। রাধু লাভ না হওয়ায় তেমন অসুখী হয় নাই, তবে দোকান উঠিয়া যাওয়ায় বড় দুঃখ পাইল, তাহার কারণ দুইটি। চতুর মতি টের পাইয়াছিল, রাধু প্রশংসা চায়, তাই যথাতথা তাহার সাহায্যের ও খাটুনির কথাটা রটাইয়া বেড়াইত এবং যখন তখন এর ওর নাম করিয়া আসিয়া সত্য মিথ্যা স্তুতি রাধুকে শুনাইয়া যাইত। রাধু পরমহৃষ্টচিত্তে ভ্রূ কপালে তুলিয়া হা হা হো হো করিয়া হাসিতে হাসিতে বলিত, “তাই নাকি, হা হা হা; তাই নাকি? তার পর?” দোকান উঠিয়া যাওয়ায় এই অল্পপ্রসাদ-রূপ অহিফেনের খোরাকী বন্ধ হইল। এই গেল এক কারণ। রাজস মাতাল রাধু এখন কি নেশায় দিন কাটায়?

দোকান বন্ধ হওয়ায় দুঃখ পাইবার আর এক কারণ বৈষ্ণবীর অদর্শন। সরলবুদ্ধি রাধুর পেট হইতে কথা পাইতে মতিকে বেশি বেগ পাইতে হয় নাই, সে শীঘ্রই বুঝিল কে তাহার মতিগতি ফিরিবার কারণ। সুন্দরী যুবতী বৈষ্ণবীর কথা শুনিয়া এতদিন মতি মনে মনে ঠিক দিয়া রাখিয়া ছিল মসীদবেড়ের সাধু একটা ভেকধারী ভণ্ড বই আর কিছু নয়। কিন্তু এই বৈষ্ণবী ইহাদের সহিত দুর্ভিক্ষের সেবা কার্য্যে আসিয়া যোগ দিল। গোপীনাথপুর মসীদবেড়ে দইচক চন্দনা প্রভৃতি গ্রামে আবাল বৃদ্ধ যুবতী এই সাক্ষাৎ করুণারূপিণী ব্রহ্মচারিণীকে রাঙ্গা মা বলিয়া ডাকিত, তর্কালঙ্কার ঠাকুর ডাকিত রাঙ্গাদিদি বলিয়া, তাঁহার অপেক্ষা বয়সে ছোট হইলেও এটা তাহার আদরের নাম। ক্রমে এই অসাধারণ মেয়ে মতির মনও টানিল।

এই দুর্দিনে বুভুক্ষিতের সেবা উপলক্ষ্য করিয়া মতির বাটীতে ও দীন দুঃখীর কুটীরে বৈষ্ণবীর সহিত রাধুর অনেক বার দেখা সাক্ষাৎ হয়।

কত স্থানে কত ভাবে তাহার সেই গৈরিকোজ্জ্বল অম্লানজ্যোতি রূপ মাধুরী রাধু চক্ষু ভরিয়া দেখিল। কিন্তু দেখিয়াই কি সাধ মিটে? সেই বিদ্দ্যুদ্দাম লাবণ্যের দাগ রাধুর বুকে দেখিয়া দেখিয়া আকাঙ্ক্ষা করিয়া করিয়া দিন দিন আরো গভীর তুরপনেয় হইয়া বসিতে ছিল মাত্র। যখন দুর্ভিক্ষ গেল, তখন বৈষ্ণবীর দেখায় একরূপ বঞ্চিত হইয়া রাধু দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া ভাবিল, "আবার দুর্ভিক্ষ হয় না?" যদি মড়কে সংসার জন-শূন্য হইলে নিত্য সে তাহার দেখা পাইত, তাহা হইলে বোধ হয় বিধির দ্বারে রাধু যুক্তকরে মড়কের প্রার্থনা জানাইত। অগত্যা নিরাশ হইয়া সে মনকে বুঝাইতে লাগিল, "সে ব্রাহ্মণ-কন্যা, বৈষ্ণবী, দেবপূজার নিষ্পাপ কুন্দ-কুসুম। আর আমি খুনে লম্পট, নেশাখোর; এখন যেন ও সব ছেড়েচি, কিন্তু এই সেদিন তো তাই ছিলুম।" রাধিকার মন কিন্তু তাহা বুঝিতে চাহিল না, সে বলিল, "দূর হইতে দেখিব বইতো না, তাহাতে কাহার কি ক্ষতি? এখানে ভালবাসা অধর্ম্ম, তা হউক, আমি তো আজন্ম পঙ্কই খেলাম। আমি নীচে কেঁচোর মত পড়িয়া পঙ্ক খাইব, আর সে সহস্রদল পদ্মটি হইয়া ঢল ঢল রূপ লইয়া অম্লান শোভায় উপরে ফুটিয়া থাকিবে। তাহাতে আমার নরক-গতি হয় হউক না, তাহার তো কোন ক্ষতি হইবে না। তবে এ প্রেমের মধ্যে অধর্ম্মটা কোন্ খানে?"

লালসা-পরবশের যা' যুক্তি রাধুর মন তাহাই গ্রহণ করিল। কেবল পার্থক্যের মধ্যে এইটুকু যে নারী সম্বন্ধে পূর্ব্বে রাধু কামের কীট ছিল, এখন প্রেমের উপাসক হইল। বাসনা যে শুধু দেখায় দু' চার দিন বই অধিক কাল তৃপ্ত থাকিবে না, কেবল ঐটুকু সে বুঝিল না। ঘুঘু-বধূ ব্যাধের গুলিতে মরিয়া পড়িয়া গেলে ঘুঘু যেমন তাহাকে ঘিরিয়া মৃত্যু-ভয় হারাইয়া কেবলি চক্রাকারে উড়িতে থাকে; মনকে চোখ ঠারিয়া

বিবেকের মুখ বাঁধিয়া ফেলিয়া রাখিয়া তেমনি করিয়া রাধু মসীদবেড়ের বনের আশে পাশে ঘুরিতে লাগিল। যদি কোন গতিকে এক আধবার ক্ষণিকের দেখা মিলে! ও বনের মধ্যে রাধু বড় একটা গেল না; সাধুর সেই মগ্নতার শান্ত-শীতল হাসি আর স্থির মূর্ত্তিকে তাহার বড় ভয়; দেখিলেই সব কেমন যেন গোলমাল হইয়া যায়। রাধুর মন মতির উপর ঝাঁকিয়া বসিল। সে অনেক বার ভাবিল .বৈষ্ণবীর কাছে একান্তে একবার প্রেমভিক্ষা করিয়া দেখিবে। হাজার হইলেও সেই ত? একান্তই কি উপেক্ষা করিবে? কিন্তু হইয়া উঠিল না, বড় মনোমোহিনী সুন্দরী বটে, কিন্তু বড় তেজ! অকলঙ্কা সতীর কামহারিণী পুণ্য-প্রভার সহিত গৈরিক-মণ্ডিতা সে দেবীশ্রীর বড় প্রতিহত করিবার শক্তি। এতদিন যে শ্রেণীর নারীকে রাধু লুব্ধ করিয়া ক্ষণিক ভোগলালসার অঙ্কপুত্তলী করিয়াছে এ মোটেই সেরূপ নহে। এত দিন দেখা পাইয়া কথা বলিয়াও রাধিকা বুঝিতে পারিল না, যে, সে তাহার এত ভালবাসার এমন অহরহ অন্বেষণের ভাবটুকু বুঝিল কি না। মেয়েলোক এত চাপা হয়! শেষে মরিয়া হইয়া রাধু কিছু দিন তাহাকে খুঁজিল না, ঘরে বসিয়া দিবারাত্র তামাক টানিল, দুই চার দিন ঝড়ের মত মতির অসংখ্য কাজে ঘুরিল, কিন্তু এ স্বেচ্ছাকৃত অদর্শনের ফলে ক্ষণিক বিস্মৃতির বশে অভাবের বেদনা দিবসে মন্দজ্বালা হইলে কি হইবে? রাত্রে যখন কিছু করিবার নাই তখন আবার সেই স্মৃতির সুখপুলক, মনের সেই চাহিয়া চাহিয়া আছাড়িয়া বিনাইয়া কাঁদা।

আজ প্রায় দশ এগার মাস হইল বৈষ্ণবী এ অঞ্চলে আসিয়াছে; এরই মধ্যে সে গোপীনাথপুর ও মসীদবেড়ের ঘরে ঘরে সকলের আপনার জনের মত হইয়া পড়িয়াছে। বিশেষতঃ মতিদের ওখানে মিত্রবাটীতে দিনান্তে একবার তাহার দেখা না পাইলে সকলের

আহার নিদ্রা ত্যাগ হইয়া যায়। গোপীনাথপুরে সে নিত্য আসিতে পারে না, সৌদামিনী বড় কান্নাহাটি আরম্ভ করিলে কাজেই মাঝে মাঝে আসিতে হয়। মিত্রগৃহিণী তাহার দেখা পাইলেই যেন আকাশের চাঁদ হাতে পান, যতক্ষণ সে না যায়! তাহাকে কোলের কাছে লইয়া বসিয়া থাকেন, অতৃপ্ত স্নেহে মুখখানি দেখিয়া দেখিয়া বলেন, "তোকে যে মা কি চক্ষে দেখেছি বলতে পারি নে, তোকে নিশ্চয় জন্মজন্মান্তরে পেটে ধরেছিলুম; হতভাগী মাকে দিনান্তে এক বার দেখা দিতে ভুলিস্‌নেকো।" এই অকৃত্রিম স্নেহ পাইয়া বৈষ্ণবী ও তাঁহার নিকট পেটের সন্তানের মত হইয়া গিয়াছে, যখন তখন পথে ঘাটে ক্ষুধাতৃষ্ণা পাইলেই তাঁহার কাছে খাইতে আসে। ইহাতে বাড়ীর অন্যান্য আত্মীয়াদের বড় হিংসা। বৈষ্ণবী বাটীতে আসিলে তাহারা সে দিক আর মাড়ায় না, পাড়ার বয়স্যাদের মধ্যে নাক সিঁটকাইয়া বলে, "গিন্নী যেন কি! এমনতর নেকী বুঝি আর দেখিনি; কোথাকার সত্তিক জেতের ভিখিরী কাঙ্গালী ঘরে এনে নাই দেবে, ছোঁয়া ঘাঁটা হয় তা' ঘেন্না পিত্তি বলে নেই।" ক্রমশঃ সাহস পাইয়া দুই চার জন বর্ষীয়সী এমন পথে-কুড়াইয়া-পাওয়া ভিখারীর সহিত মিতালী করায় গৃহিণীকে অনুযোগ করিয়াছিল। কিন্তু সদানন্দময়ী সৌদামিনীর হালকা হাসির হাওয়ায় সে ঘর-ভাঙ্গান মেঘ ভারী হইয়া জমিতে পায় নাই। তিনি উত্তরে বলিয়াছিলেন, "আমি নিজের চক্ষে দেখে এইচি, বাছা। ওর গুরু সাক্ষাৎ শিব, নইলে এতটুকু দুধের বাছাকে ছুঁয়ে অমন বৈরিগী করে দিতে পারে?" গৃহিণীর কিন্তু বড় কৌতূহল,—এ মেয়ে কে? তিনি একদিন মাছোড়বান্দা হইয়া ধরিয়া বসিলেন, "বল্‌ মা, তুই কাদের মেয়ে?" বৈষ্ণবী শুধু হাসে, বড় পিড়াপীড়ি করিলে বলে; "সত্যি মা, আমার কেউ নেই।"

সৌ। কোথায় ছিলি মা?

বৈ। মথুরায়, ভারতী ঠাকুরের কুঞ্জে।

সৌ। তোকে এমন বৈরিগী কল্লে কি করে?

বৈ। সেখানে যে বৈরিগী ছাড়া কিচ্ছু নেই। যখন আমি এতটুকু মেয়ে, তখন থেকে তাঁর কাছে চৈতন্যমঙ্গল পড়েছি, খঞ্জনী বাজিয়ে সঙ্কীর্ত্তন করতে শিখেছি, জপ ধ্যান অভ্যেস করেছি। ছেলে মানষের মন, মা, কাদার-তাল; যেমন ছাঁচে ঢাল তেমনিটি গড়ে ওঠে। ঠাকুর বড় সাধক ছিলেন, মা; সব শিখিয়ে একদিন আমায় ছুঁয়ে কেমনতর করে দিয়েছিলেন। এখন যাঁর কাছে আছি, অজ্ঞান হয়ে বসে বসে দেখছিলুম যেন উনি এসে এক চড় মেরে ঠাকুরকে বলচেন, "কি কল্লি রে, ওর মাথায় যে এখনও কালচক্র ঘুরচে",—আর ঠাকুর তাঁর পা ধরে কাঁদচেন। জেগে দেখলুম ইনি নেই, কিন্তু ঠাকুর সত্যিই লুটিয়ে লুটিয়ে কাঁদচেন। সেইদিন জানলুম বাবা ঠাকুরের গুরু।

সৌ। ঠাকুরকে ছেড়ে এলি কেন, মা?

বৈ। অদেষ্টে দুঃখু আছে, মা, তাইখণ্ডাতে। আর বাবা টানছিলেন, কিন্তু অনেক ঘুর-পথে অনেক কাদা ঘেঁটে ওঁর কাছে পঁউচেছি। কাছে এলে কি হবে, এখনও নাগাল পেলুম না; সামনে সাগরভরা জল, বুকভরা তেষ্টা নিয়েও আমার তা' খাবার জো নেই।

সৌ। সেখানে কি হয়েছিল, বাছা?

বৈ। তুমি মা, তোমার কাছে লুকোব না। সেখানে মালতী বলে একটা মেয়ে ছিল, সেও বৈষ্ণবী। তার সঙ্গে আমার বড় ভাব ছিল। গোষ্ঠ বোষ্টমের হাতে পড়ে মেয়েটা খারাপ হয়ে যায়। ঠাকুর দু'জনের গৈরিক কণ্ঠী কেড়ে নিয়ে তাড়িয়ে দিলেন। মেয়েটা আমার কাছে এসে কেঁদে পড়লো। আমি তাঁকে গিয়ে ধত্তে তিনি বল্লেন, "ওদের

এ অপরাধ মাপ করবার বল আমার কই, মা? তা' হলে আমার আশ্রম টি'কবে না।" সেইদিন মালতীর হাত ধরে আমিও তাঁর আশ্রম ছেড়ে বেরিয়ে এলুম, তখন আমি বড় একরোখা অভিমানী ছিলুম, ঠাকুরকে বল্লুম, "যেখানে দুঃখী তাপী দুর্ব্বলের ঠাঁই নেই সেখানে আমিও থাকবো না। ঠাকুর হেসে বল্লেন, "তবে যাও, মা; বুঝি বাবা তোমায় এত দিনে টেনেছেন।"

একাদশ পরিচ্ছেদ।

ভাবের সুখ—অভাবের দুঃখ।

ইন্দিরা যখন চার বৎসরের শিশু তখন হইতে সে মতির মাতা সৌদামিনীর কোলে পিঠে মানুষ হইয়াছে। কার্ত্তিক দত্ত ও মতির পিতা হরিহরে বড় ভাব ছিল ; এ দরিদ্র পরিবারে দুঃখ পাইবে বলিয়া সৌদামিনী ইন্দিরাকে চাহিয়া লইয়া নিজে লালন পালন করেন। তাই বয়স হইয়া যখন সে মতির অঙ্কলক্ষ্মীর পদ গ্রহণ করিল, তখন বধূজীবনের স্বাভাবিক লজ্জা ও সঙ্কোচেও তাহাকে জড়সড় করিয়া তুলিতে পারে নাই। এমন কি বাল্যের ক্রীড়াসহচর চিরপরিচিত স্বামী দেবতাটিও তাহার কাছে তেমনি সহজ খেলার সাথী রহিয়া গেল।

বউ হইয়া আসা অবধি তাহার অত্যাচারে সৌদামিনী ঠাকুরাণী রন্ধনশালা ও ভাঁড়ার হইতে বেদখল হইয়া জপের মালা লইয়া বসিলেন। হাতা খুন্তি আচার কাসন্দির হাঁড়ি চাবির গোছা লইয়া এতটুকু ইন্দিরা গৃহিণী সাজিয়া মহাসুখে এ সংসার মাথায় করিয়া বসিল। সে যখন ছ্যাক্ কল্ কল্ করিয়া রাঁধে, চচ্চড়ির মসলা ডালনায় দেয়, থাবা থাবা নুন লঙ্কা খরচ করে, তখন রন্ধনশালার চৌকাঠে মালাহাতে বসিয়া বসিয়া সৌদামিনী ফ্যাল্ ফ্যাল্ করিয়া চাহিয়া থাকেন। কিছু বলিবার যো নাই, তাঁহারই কত আদরের বৌ, অথচ চুপ করিয়া দেখা মুস্কিল। বলিলে, কথা শুনে না, তিরস্কার করিলে ঢিপ ঢিপ করিয়া মাথা খোঁড়ে।

মতির ইচ্ছা স্ত্রীকে নিজের ভাবে মাতাইবে। স্বামীর মুখে বড় বড় উপদেশ শুনিলে প্রথমটা ইন্দিরা কতকক্ষণ গম্ভীর হইবার দুঃসাধ্য চেষ্টা করিত, কিন্তু শীঘ্রই তাহার বাঁধভাঙ্গা উচ্ছল হাসির চোটে বেসামাল হইয়া মুখে কাপড় দিয়া কুটিপাটি হইত। মতি রাগিয়া গেলে তাড়াতাড়ি উঠিয়া তাহার পায়ে গড় হইতে হইতে বলিত, "আমি তোমার দাসী; তোমার ঘর ঝেঁটোব, উনন নিকোব, মাছের ঝোল, ডালনা, ধোঁকা রেঁধে খাওয়াব, তুমি ঘরে এলে পান এনে দেব, ঘুমুলে বাতাস করবো, বাস্। আমাকে দে বিবিপনা হবে না গো হবে না। তা' যদি চাও একটা বেহ্ম কি খিশ্চেন সতীন আন গে। আমার মুড়ো ঝাঁ্যাটাগুলো কাজে নেগে যাবেখন্।" ইন্দিরা ভাল রকমেই জানিত যে তাহার স্বামীর দ্বারা সতীন আনার মত দুষ্কর্ম্ম কদাচ হইবে না; তাই তাহার এত সাহস। সতীন সত্যসত্যই আসিলে তাহার দড়ি বা বিষ ছাড়া গত্যন্তর ছিল না, তাই বলি হয়তো মতি এমন উৎকট মরালিষ্ট না হইয়া সে দরের লোক হইলে ইন্দিরা ভয়ে ভয়ে কিছু বা শিখিত!

ইন্দিরা প্রায় বাপকে দেখিতে ওপাড়ায় যাইত, আজও গিয়াছিল। ফিরতিকালে বাটী পঁহুছিয়া ইন্দিরা প্রথম ডাকাতপড়ার মত মার মার করিয়া গিয়া রন্ধননিযুক্তা শাশুড়ীর হাতের হাতা খুন্তি কাড়িয়া লইল; তাঁহার অপরাধ, পুত্রবধূর অবর্ত্তমানে তিনি রাঁধিতেছেন। "আবার, মা, তুমি আগুন জ্বালে গেছ? কেন, বামুনমাসীকে কি কেউ রুক্মিণী-হরণ করে নে গ্যাছে নাকি গা? তুমি এমন কল্লে আমি কুয়োয় পড়ে মরবো, সত্যি বলচি, মা, আমি জুগিদের অশথ গাছে গলায় দড়ি দেব।"

সৌ। ষাট ষাট! অমন অকল্যাণের কথা বলে? বামুনমাসীর

রান্না মতি খেতে পারবে কেন গা ? যে জলভস্কা পান্সে ঝোল রাঁধে, মেগো। ডালে ছোলাগুনো ড্যাব্‌ড্যাব্ করে চোখ, পাকিয়ে চেয়ে থাকে। ব্যন্ননে নুন থাকে তো ঝাল হয় না, ঝাল নুন হলো তো তলা ধরে এঁকে যায়।

ই। তা' হোক্‌গে। বাবাকে যে একটু দেখতে যাব তোমার শত্তুরতার জ্বালায় তারও যো নেই। কাল কে রেঁধেছিল ?

সৌ। আর নে বাছা, আমার ঘাট হয়েচে। এতটুকু থেকে তোদের রেঁধে বেড়ে খাইয়ে মানুষ করলুম, আর আজ আগুন জ্বালে ভিরমি যাবো নাকি ?

ই। "য়্যা! কালকেও দু'বেলা রেঁধেছিলে ?" বলিয়া ইন্দিরা দুম্ দুম্ করিয়া দেয়ালে মাথা ঠুকিতে লাগিল। ব্যস্ত সমস্ত ভাবে সৌদামিনী ঠাকুরাণী তাহাকে ধরিলেন, মাথায় হাত বুলাইয়া দিতে দিতে বলিলেন, "লক্ষ্মী মা আমার, অমনতর করিস্ নে; আর আমি রাঁধবো না।" রাত্রে শাশুড়ীকে খাওয়াইয়া পাকা চুল তুলিয়া দিয়া রামায়ণ পাঠ করিতে করিতে ঘুম পাড়াইয়া ইন্দিরা স্বামীর ঘরে গেল। মতি দেরাজের কাছে হাত বাক্সের উপর ঝুঁকিয়া কি লিখিতেছিল। ইন্দিরা আসিয়া মাদুরে ঢলিয়া পড়িয়া একরাশ তেলমাখা চুলের বন্যায় মতিকে ডুবাইয়া তাহার ঘাড়ে পড়ে পড়ে দেখিয়া মতি কলম রাখিয়া দিল, বলিল, "এলে তো ?"

ই। পান এনেচি গো, পান। দুপুর রাত হতে চল্লো এত কি ছাই ভস্ম নিকচো ?

ম। বাস্, আর কোন্ দুর্জ্জন লেখে। এই নাও, বাক্সে তুলচি।

ই। না আমার মাথা খাও, বল না কি নিকছিলে।

ম। শুনতে তো কত ইচ্ছে। বলতে গেলেই ক্ষাণিক পরে এক্ষুণি হাই উঠবে, মাথা ঢুলে চোখ বুঁজে আসবে।

ই। ও গো, তোমার ঠাকুরের দিব্যি, বল।

ম। লিখছিলুম মানুষ কি চায়।

ই। কি চায়?

ম। তুমি বুঝবে না।

ই। বুঝবো গো বুঝবো, তোমার পায়ে পড়ি, বলো।

ম। তা' যে বলে বোঝান যায় না, খুব কম লোক এ ত্বনিয়ায় নিজের কামনার বিষয় জানে। তোমার রাঙাদিদিকে জিজ্ঞেস্ কোরো, সে বুঝিয়ে দেবে।

ই। তুমি আমায় ছাড়া আরও কিছু চাও নাকি? সুখ টাকা কড়ি ছেলে পুলে সে তো আমার জন্যেই চাও।

ম। ইস্!

ইন্দিরা মুখ আঁধার করিয়া রহিল, ক্ষণেক পর বলিল, "আমি তো তোমাকে ছাড়া আর কিছুই চাইনে, আমি কি তবে মানুষ নই?"

ম। একদিন তুমি পুতুল চাইতে, সন্দেশ মেঠাই পাকা পেয়ারা কুল এমনি কত কি চাইতে। আজ বড় হয়েচ, আজ আমাকে চাও, এই ঘর সংসার সুখসচ্ছন্দতাটুকু চাও, আরও অনেক জিনিস চাও। এই যে চাই চাই করে হাতড়ে বেড়ান এই হচ্ছে মানুষ হ'বার পথ।

ই। বুছেচি গো বুঝেচি।

ইন্দিরা মুখ আঁধার করিয়া বসিয়া রহিল। সে শুধু বুঝিল না তাহা নহে, ভুল করিয়া ফেলিল।

মসীদবেড়ের বনে সাধু অলখনাথের কাছে মতির সহিত বৈষ্ণবীর যে বিচার আরম্ভ হইল, ত্বর্ভিক্ষ শেষ হইলেও তাহা ফুরাইল না। অধিকন্তু এই পরমার্থ-কথা অবলম্বন করিয়া উভয়ের মধ্যে এক মধুর সম্বন্ধের স্থাপনা হইল। মতির অর্দ্ধাঙ্গিনী ইন্দিরা তাহার জীবনের

আদর্শের মহত্ত্ব বুঝিল না, বুঝিল তাহার তিন কুলের কেউ নয় এই বৈষ্ণবী মেয়ে। সে শুধু বুঝিল নহে, তাহার গুরুদত্ত পরমার্থ ভাবযোগে মতির আদর্শ লইয়া এক অনুপম সামঞ্জস্যে পরিণত করিল। মতি সমাজ শরীরে শুধু ক্ষত ও ব্রণ খুঁজিয়া বেড়াইত,—সে ছিল অশন বসন ভূষণে এই সমাজ দেবতার সেবার কাঙ্গাল। আর এই বৈষ্ণবীর সহিত মতির মন মিলিবার পর দু'জনের কামনায় যাহা গড়িয়া উঠিল, তাহা হিন্দু সমাজের সাক্ষাৎ আত্মতত্ত্ব। তাহা অক্ষুণ্ণ থাকিলে এই সমাজ নিজেকে ভাঙ্গিয়া চুরিয়া শুধু একটা নহে এমন কত নিরাময় সুপুষ্ট সবল দেহ গড়িয়া লইতে পারে। ইহা শুধু হিন্দু সমাজের নহে, সমস্ত মানব সমাজের অন্তরতম সঞ্জীবন তত্ত্ব, ইহা স্পর্শ করিয়াই ঈশা বুদ্ধ, শঙ্কর, গুরুগোবিন্দ ও আর্য্য ঋষিগণ মানব সমাজে নূতন নূতন প্রেরণা আনিয়া নব নব যুগের পত্তন করিয়া গিয়াছিলেন।

মতির সহিত বৈষ্ণবীর মত মিলিত না, আবার মিলিতও বটে। মতি ঐহিকের কথা জীবনের কথা বলিত, বৈষ্ণবী বলিত অন্তর-দেবতার রূপের কথা। এ চাহিত দেহ, ও চাহিত আত্মা; দেহ ও আত্মার মিলনও যেমন নিবিড়, বিরোধও তেমনি নিত্য-নৈমিত্তিক। তাই এত বকাবকি মারামারি করিয়াও দু'জনে কেহ কাহারও সঙ্গ ছাড়িতে পারিত না; আত্মা দেহকে টানিত। ইহারা দু'জনে বিরোধ কলহ করিতে করিতে যেন জীবনের একই পথে বড়ই মনের সুখে চলিত। গ্রামের কত লোকে কত কি বলিত, এ উহার মুখ চাহিয়া মুচকি হাসিয়া চক্ষু ঠারিত। এই দুই পাগলের বেহুঁস কানে কিন্তু তাহার একবর্ণও প্রবেশ করিত না, এ সব যত জঞ্জাল শুনিত ইন্দিরা—শুনিয়া নিভৃতে কাঁদিয়া মরিত।

যখন মতি অনর্গল বকিয়া যাইত, আর বৈষ্ণবী গালে হাত দিয়া ঘণ্টার পর ঘণ্টা তাহার মুখপানে চাহিয়া থাকিত, তখন নির্বুদ্ধি ইন্দিরা

এ বকাবকির বিন্দু বিসর্গও না বুঝিতে পারিয়া বসিয়া বসিয়া হাই তুলিত ঢুলিত, এবং কখনও বা কার্য্যান্তরে উঠিয়া যাইত। তাহার পর দুই জনে উঠিয়া অলখনাথ মন্দিরে চলিয়া যাইত, আর ইন্দিরা স্বামীর আশাপথ চাহিয়া হা পিত্তেশ করিয়া রাত্র একটা অবধি বসিয়া থাকিত। স্বামী কোন দিন ফিরিত, কোন দিন ফিরিত না। এমনি করিয়া ক্রমশঃ মতির মধ্যে এক ভাবান্তর দেখা দিল। সে সর্ব্বদাই কেমন উদাস উদাস, চক্ষুতে কোন ঔৎসুক্য বা অভিনিবেশ নাই, একস্থানে বসিলে আর সহজে উঠিতে চাহে না, কেবলি গালে হাত দিয়া ভাবে, আহার নিদ্রার জন্য ডাকাডাকি ঠেলাঠেলি অনেক উপদ্রব করিয়া সাড় আনিতে হয়। ইন্দিরা ভাবিল, "এ কি হলো? এত কিসের ভাবনা?" বৈষ্ণবীর মধুর স্বভাব ও সাহচর্য্য একটি মিঠা মিড়মাখা গানের মত ইন্দিরার প্রাণ ভরিয়াছিল, এতদিন পর হঠাৎ সে গান বেসুরা বাজিল। স্ত্রীলোকের স্বামী বড় ধন, বিশেষতঃ ক্ষুদ্র সংসার-পিঞ্জরায় বন্দিনী হিন্দুনারীর। অধিকন্তু ইন্দিরা অশিক্ষিতা গেঁয়ো মেয়ে, পতির প্রাণের গভীর ধারাটির সন্ধান মোটেই রাখিত না, তাই ভুল বড় সহজেই হইল। মাসের পর মাস স্বামীর এই উন্মনা মগ্নভাব লক্ষ্য করিয়া করিয়া সে দিদির রূপের কথা ভাবিল, তাহার বুদ্ধি, সাহস, গীতশক্তি, শাস্ত্রজ্ঞান প্রভৃতি নানা গুণের কথা ভাবিল, লোকনিন্দা শুনিল, তাহার পর একান্তে বালিশে মুখ গুঁজিয়া বড় কান্না কাঁদিল। কাঁদিয়া মনের বোঝা লঘু হইলে ইন্দিরা মনে মনে স্থির করিল স্বামীর উচ্চভাবের মর্ম্ম সে প্রাণপণ করিয়া বুঝিবে; এ পুষ্পের মধু ও সৌরভের সেই ত অধিকারী, তাহার জন্য যাহা ফুটিয়াছে তাহা সে না লইলে বোলতা ভীমরুলে তো খাইয়া যাইবেই। কিন্তু বুঝিব বলিলেই কি সব বুঝা যায়? বিধি-বাজীকর কি মশলা দিয়া মানুষ গড়িয়াছে কে জানে, একজনের পক্ষে যে চেষ্টা

সহজ ছেলেখেলা মাত্র, অন্যের তাহাই পণ্ডশ্রম। সমাজ কোথায় পরমার্থ-পথভ্রষ্ট হইয়া মানুষের পায়ের শিকল হইয়াছে, ইহার্থ ও পরমার্থের মিলন ভূমি কোন্‌খানে এইরূপ অগুন্তি অফুরন্ত প্রহেলিকা শুনিতে শুনিতে ইন্দিরার মাথা টন্‌ টন্‌ করিত; সে হাঁ করিয়া কেবল দিদির মুনিমন-টলান রূপ ও স্বামীর তন্ময় বিহ্বলতা দেখিয়া দেখিয়া গোপনে তপ্তশ্বাস ফেলিত। মতির সহিত কথা না বলিয়া যখন রাঙ্গা দিদি তাহার সহিত কথা বলে, তখন তাহার আদর, চৌম্বক-আকর্ষণ ও মধুর ব্যবহারে ইন্দিরার যেন সকল সংশয় কাটিয়া যায়; কিন্তু যখনি দিদি তাহার পদ্মচক্ষু মতির দিকে ফিরায়, স্বামীর কথায় সায় দিয়া তাঁহার মনের মত কত জ্ঞানের কথা বলে, তখনই তাহার প্রাণটা আবার পাকা ফোড়ার মত ব্যথায় দপ্‌ দপ্‌ টন্‌ টন্‌ করিতে থাকে। "দিদি আমাকেই এমনতর গুণ করে রাখে, তবে ওঁর তো পুরুষের মন, সহজে রূপের ভিখারী সহজে গুণমুগ্ধ। হায়! হায়! আমার কপাল বুঝি সত্যিই ভেঙ্গেছে।" হয় তো এখনি ইন্দিরা এমনি ভাবে, আবার স্বামীকে একা কাছে পাইলে সে ভাব কাটিয়া গিয়া অনুতাপে কেমন এতটুকু হইয়া যায়, ভাবে, "বুঝি আমার মনই পাপী, ধর্ম্মবুদ্ধিতে স্থির বিদ্যায় উজ্জ্বল অমন শিবের মত দেবতা, কি পদস্খলিত হইতে পারে।" কিন্তু অনেক ভাবিয়াও এ দুর্ভাবনার কোনই একটা কূল মিলিল না। ইন্দিরার মুখখানি ছিল বসন্তের মত হাসিতে ও জীবন-হিল্লোলে ভরা ঢল ঢল, এখন মাঝে মাঝে তাহা শরতের বর্ষোন্মুখ ভাব ধারণ করিতে লাগিল।

পরদিন দ্বিপ্রহরে বৈষ্ণবী ও মতিতে কথা হইতেছিল, ইন্দিরা মাদুরে নিদ্রিতা শাশুড়ীর কাছে বসিয়া সুপারি কাটিতে কাটিতে হেঁট মুখে তাহা শুনিতেছিল। মনের পাপ বড় বিড়ম্বনা, চোখে চোখে চাওয়া যায় না।

বৈ। তোমার কথায় মন মাতে, কিন্তু বড় অস্বস্তি উদ্বেগ এনে দেয়। আমাদের দোষে নাকি সব আটকে রয়েচে, কিছুই হচ্চে না। নিজের জীবন নিয়ে আগে এত ভাবনা চিন্তে ছিল না, এই সব শুনে শুনে এক একবার মনে হয় বুঝি যা' কচ্চি সবই ভুল। তারপর সবুজ মাঠে গাছ গুলোর মাঝে গে দু'দণ্ড বসলে এ মেঘ কেটে যায়, ঘাড়ের বোঝা যেন কে এসে নামিয়ে নেয়।

ম। তোমাকে আর বাবাকে পেয়ে অবধি আমারও কোথায় একটা কি উল্টো পাল্টা হয়ে গেছে। আগে ভাবতুম গলদটা বুঝি বাইরে, তাই ভগবানের দুনিয়া ভেঙ্গে গড়বার এত হাঁকাই ছিল। বাবাকে দেখে বুঝেচি নিজের মনের কোথায় কি কোঁচ ধরে গেছে, সেইটে টেনেটুনে সোজা কহ্বে দিতে পারলেই সব অপূর্ণ সমান সরস সমান পূর্ণ হয়ে উঠবে।

বৈ। তোমরা শুধু চ্যাচাও, এত চেঁচামেচি কেউ তো শোনেও না। তোমাদের মধ্যে পরশ পাথর নেই যে, তা' হলে আর বলতে হতো না, একবার সামনে গিয়ে দাঁড়ালেই হ'তো।

ম। ঠাকুর দেবতা মানি নে।

বৈ। মনের সংসার, তাই মন দিয়ে বসে বসে যা' দেখ তাই ঠিক; তোমার কাছে কিছু নেই, আমার কাছে সবই আছে। তোমরা কাজ কাজ কর, আমার প্রাণটা শুধু শান্তি শুধু প্রেম খুঁজচে। তোমরা ইংরিজি পড়ে কেমন এক রকম হয়ে গেছ, তাই নিজের দেশের এ অন্তরের ডাক এ ক্ষিধে বোঝ না।

ম। ওটা অন্তরের ডাক, এটা কি তা' নয়? শান্তিই কি সব, অশান্তি দুঃখ হাহাকার তবে কি?

বৈষ্ণবীর ছিল যুক্তিতর্কহীন নির্ম্মল মুগ্ধ ভক্তি ও প্রেম, আর

তাহার সহিত বড় মধুর যোগে মিশান সহজিয়া জ্ঞান। তাহার একান্তই নারীর প্রাণ, সেখানে যাহাই বাজে ভাবের তারে মীড় জাগাইয়া বাজে। মতির পুরুষের কঠিন প্রাণ, সেখানে ছিল নিছক জ্ঞানের তুষার-ধবল মগ্ন মহিমা, আজকাল সাধু অলখনাথের স্পর্শে সেই অখণ্ড স্বচ্ছ স্ফটিক শিলা গলিয়া হরিদ্বারের পাগলাঝোরা সবে ফুটিতে চাহিতেছিল।

বুড়া তর্কালঙ্কারও এই মেয়ের মোহে পড়িয়াছেন, দুপুর রোদে টো টো করিতে করিতে খুঁজিয়া খুঁজিয়া মতির ঘরে হাজির। তাঁহার আগমনে সৌদামিনী অন্দরে চলিয়া গেলেন, ইন্দিরা এলো চুলের উপর কাপড় একটুখানি টানিয়া দিল। বৈষ্ণবী যেমন ছিল গালে হাত দিয়া তেমনি বসিয়া রহিল। তর্কালঙ্কার 'এই যে' বলিয়া ছাতি লাঠি রাখিয়া বসিয়া পড়িলেন, বলিলেন, "তোরা, মা এইখানে থাক মতির সাহস তেজ আর তোদের আনন্দ মিশলে অসাধ্য সাধন হবে।" বৈষ্ণবী হাসিল, বলিল, "আমি ভিখারী তোমরা বড়লোক বাবুর দল, মিশ খাবে কেন?"

তর্কা। শোন একবার বেটির কথা, এ দেশের বৃদ্ধ শঙ্কর নদের গোরা সবই যে ভিখিরী গো।

ম। (মাটিতে ঘুঁসি মারিয়া) ডাউন্ উইথ্ শোসিয়াল ডমিনেশন্। তোমাদের ঐগুলো বুঝি নে, বাপু। আমরা যদি এতই বড়, তবে পড়লুম কেন?

তর্কা। নিজের আদর্শ ভুলে। হিন্দু টিকি রাখে, তিলক কাটে, রাস ঝুলন যাত্রায় আবির মাখে, শিব পূজোয় ভাঙ গাঁজা খায়, জাত বাঁচিয়ে ছোঁয়া ঘাঁটা বাঁচিয়ে পা টিপে টিপে চলে—

ম। আমরাও তো তাই বলি। জাত তুলে দাও।

তর্কা। ঐ কথাটি হিন্দুর দিক দিয়ে বলতে হবে, আর যে বলবে

সে হওয়া চাই হিন্দুকুলচূড়ামণি। জাত তোলবার কথা এমন করে না বলে বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের কথা বল না।

ম। কি কথা?

তর্কা। বর্ণাশ্রম ভগবানের সৃষ্টি, স্বভাবের সহজ নিয়ম, জগদ্ব্যাপী, তার ব্যতিক্রম কোথায়ও নাই। "আমি অব্যয় অকর্ত্তাই তার কর্ত্তা", আর "গুণ ও কর্ম্মের বিভাগ অনুসারে চার বর্ণের সৃষ্টি করেছি" এই ত গীতার কথা।

"যথর্ত্তু লিঙ্গানৃতবঃ স্বয়মেবর্ত্তু পর্য্যয়ে।
স্বানি স্বান্যভিপশ্যন্তে তথা কর্ম্মাণি দেহিনঃ॥"

বসন্ত শীত বর্ষা এই সব ঋতু এলে তার চিহ্নগুলি আপনি সংসার ভরে জেগে ওঠে, কর্ম্ম ও গুণ ঠিক তেমনি দেহীর স্বভাবে ফুটে ওঠে। তুমি চেষ্টা কল্লে বরঞ্চ গঙ্গা ব্রহ্মপুত্রের গতি ফেরাতে পার, যে রজের অবতার হয়ে দুনিয়া উল্টে দিতে জন্মেচে, তাকে ব্রাহ্মণের মত শান্ত করতে পার না। আবার ভগবান যাকে সত্ত্ব দিয়ে গড়েচেন, সে যত অধম কুলেই জন্মাক না কেন, চামার রুহিদাস, বেণে নানক, মেথর লালগুরু, ছুতর তুকারামের মত ব্রহ্মজ্ঞানী হবেই হবে, তারাই ব্রাহ্মণ। পশু পাখীর মধ্যেও এই গুণকর্ম্মের বিভাগ রয়েচে, সিংহ বাঘ হিংস্র মাংসাশী—তারা ক্ষত্রিয়; বাবুইপাখী বল্মীক মৌমাছি এরা কলাকুশলী এরা বৈশ্য। জড়ও সব নিশ্চেষ্ট নয়, তাদের মধ্যেও অল্প বিস্তর ভাল মন্দের প্রেরণা রয়েচে। এই গুণলিপ্সায় আর কর্ম্মের মোহে জগৎ যন্ত্র-চালিতের মত কাজ করে যাচ্চে। ব্রাহ্মণের কুলে জন্মালেই ব্রাহ্মণ হওয়া স্বভাবের নিয়ম নয়, তাতে "গুণকর্ম্মবিভাগশঃ" এই ভগবদ্বাক্য ব্যর্থ হয়ে যায়। বর্ণাশ্রম স্বতঃস্ফূর্ত্ত, জাতের ছত্রিশ শ' গণ্ডী ভাগ করে করে তাকে কষ্টে বজায় রাখতে হয় না।

তার পর দেখ গীতার নিষ্কাম কর্ম্মের আদর্শ। ইউরোপ সুখকামী, ভারতও তাই। কিন্তু ইউরোপের সুখ খোঁজবার পথ, ভুল পথ; সাপেক্ষ্য সুখের সন্ধানে দুই চার বিন্দু সুখের সঙ্গে দুঃখই জোটে বেশি; বিষয়ের অভাবে দুঃখের বোঝা ভারী হয়ে ওঠে। এক একটি ভোগ পেলে কিছু সুখ; না পেলে ব্যর্থ লালসার চতুর্গুণ তাড়না, তাই ঐ সুখটুকু দুঃখেরই নামান্তর। ভারত কিন্তু নিরপেক্ষ সুখের কামী, এ সুখ কোন বিষয় পাবার অপেক্ষা রাখে না, খুঁজতে নিজের বাইরে যেতে হয় না, নিজেকে খুঁজে পেলেই যে অকাম সুখময় দশা হয় তাতে ছেলেপুলে ঘরকন্না সমাজ দেশ সবই সেই রসস্বরূপের সঙ্গে অভিন্ন হয়ে পড়ে।

ম। আবার এও সত্য যে ঐ ত্যাগপন্থী হয়েই ত ভারত ঐহিক সুখশান্তি সব খোয়াল।

তর্কা। না, তা নয়। হিন্দু এই অন্তর্মুখী দৃষ্টি হারিয়ে আচার-কীট হয়ে দাঁড়িয়েছে, কামনা ছেড়ে নিষ্কাম হতে ভুলে গিয়ে কাজ ছেড়ে নিষ্কাম হতে আরম্ভ করেছে। এ পতনের কারণ ধর্ম্ম নয়, অপধর্ম্ম; এ হ'লো ত্যাগ-পেত্নীতে পাওয়া দেশ। ভূতে পাওয়া জাতের কল্যাণ হবে কি করে?

ম। একবার ত্যাগমুখো হ'লে যে মানুষের দিগ্বিদিক জ্ঞান থাকে না; বলে সবাই ত্যাগ কর, ত্যাগই সাত কাহন। ইউরোপ একদিক দিয়ে ভুল করেছে, আমরাও আর একদিক দিয়ে ভুল করেছি!

তর্কা। ভোগকে ধরে কত জাত বড় হ'লো, তারা সব জাতীয়তার নামে পরসুখদ্রোহী; ভারত চিরদিনই ত্যাগকে ধরে উঠেচে, তাই ভারতে রাজনীতিক রাহাজানি নেই; তাই শিবাজীর ধ্বজায় গৈরিক কাপড়। ওরা সব বড় হয়ে নিতে বেরোয়, আমরা দিতে বেরুই;

'ভাব-সম্পদের চেয়ে বড় ধন আর কি আছে? যে জাত ভাব দেয়, সেই জাতই যুগনিয়ন্তা। এক দিন ফ্রান্স ইতালি দিয়েচে, আজ আমেরিকা দিচ্ছে। এমনি ঋষির দেশ ভারতও দেবে, কিন্তু নিজস্ব ধন ভুলে বিলিতি ভাব ধার করে করে কাঙ্গাল হয়ে গেলে আর দেবে কোত্থেকে? শিবাজীর গৈরিক ধ্বজা দেখুন বাঙ্গলায় এসে রাহাজানী কল্লে; মানুষ যে চিরদিনই মানুষ।

ম। তোমার ঐ বর্ণধর্ম্ম এদেশে কি ছিল?

তর্কা। ছিল কি গো? যা' নিত্যধর্ম্ম তার স্ফূর্ত্তি নেই এমন স্থান সংসারে কোথায়? ভারতে যদি নাই ছিল তা'লে জেলে ব্যাস, ক্ষত্রিয় বিশ্বামিত্র ব্রাহ্মণ হয়ে মহর্ষির পদ পেলে কি করে?

"জন্মনা জায়তে শূদ্রঃ সংস্কারাদ্দ্বিজ উচ্যতে।
বেদাভ্যাসাদ্ভবেদ্বিপ্রঃ ব্রহ্ম জানাতি ব্রাহ্মণঃ॥"

এই তো হ'লো হিন্দুর কথা। (বৈষ্ণবীর প্রতি) মা, কাঁদলি কেন? চোখে জল যে!

বৈ। তোমাদের নিষ্ঠুর কথায় কান্না যে পায়, ঠাকুর্দ্দা।' আমার সব জীবনটা ভুল! ইউরোপ কাজ কাজ করে ভ্রান্ত আর আমরা কাজ ছেড়ে ভ্রান্ত, তাহলে এখন উপায়?

তর্কা। উপায় আমাদের হাতে, আমরা সে পরম ধন না বিলোলে কে আর বিলোবে? আমরা গোল্লায় গেছি তা' ঠিক, কিন্তু এখনও হাজার লাখ কাঁটা ফলের মধ্যে এক একটাও অমৃতের ফল যে ফলচে, তা'তে বোঝা যাচ্চে এ গাছের অমৃত ধারণের শক্তি যাবার নয়। ইউরোপ শিশু, আত্মজয়ী হবার ধৈর্য্য তার নেই, তাই সে কাঁচা মন নিয়ে লোভের বশে তাড়াতাড়ি কাজে নেমেচে; তাই তারা মুখে বলে সাম্য মৈত্রী স্বাধীনতা, আর কাজে করে রাহাজানী। ঘটী বাটী

জমি জমিদারীই যদি মানুষের সুখের মূল হয়, তা'লে তার অভাব হলেই যে পরের ঘটী বাটী কাড়তে ঢাল তলোয়ার নিয়ে বেরোন ধ্রুব হয়ে পড়ে।

ম। কেন, ঘটী বাটী আমারও থাক, তোমারও থাক না?

তর্কা। সে কথা যে আত্মজয়ী ভিন্ন কেউ বলতে পারে না। ভেতরে লোভ থাকলে সে লোভ পরহিতের ধর্ম্মের এমনি কত কি জিনিসের মুখস পরে এসে হাজির হয়, আর লোভী তাকেই আবার কুলের ঠাকুর করে রাখে। পাশ্চাত্য সভ্যতায় এই তো ক্রমাগত হচ্চে।

(বৈষ্ণবীর দিকে চাহিয়া) আমার মা কি বলে?

বৈ। তোমরা ত্যাগের দোষ দিচ্ছ, আমি কিন্তু গৈরিক জটা দেখলেই আনন্দে অধীর হয়ে পড়ি, কেমন যেন মিঠে লাগে। এটা কি দোষ?

তর্কা। সংসারের এক কণাও যদি ছেড়ে দেবার জিনিসই হ'তো, মা, তা' হলে ভগবানের এতগুলো হাবিজাবি গড়বার দরকার কি ছিল?

যার মন মরেনি সে ছাড়লেই কি তার সংসার তাকে ছাড়ে? যেখানে না আছে, গ্রহণ, না আছে ত্যাগ সেই জ্ঞানের নাম অজাতি—অজাতি কিনা যার জাত নেই। যার তা' হয়েচে, তারই শিবনেত্র খুলেচে। এই শিবনেত্রই ইণ্টুইশন—জ্ঞানের অনেক ওপরে; এক পলকে সে ত্রিকাল দেখতে পায়। তার ত্যাগও যা', ভোগও তা'।

বৈ। তা' বল্লে কি হয়? যার মনটি ঠাকুর কুড়িয়ে নিয়েচেন তার যে কেরমাগত ঐ ত্যাগের দিকেই টান।

তর্কা। তবে এ সংসারের ল্যাঠা কে পোয়াবে, মা? তোরা তো ত্যাগ করে চলে গেলি।

বৈ। আমাদের বল ভরসা যে একরত্তি, মনের মধ্যে কেবল ঠুটো কাণা ইচ্ছেগুলো হাহা দে দে করে ফিরচে। আমরা কি করবো বাবা?

তর্কা। তোর ঠাকুর আনন্দ চেয়ে ফিরছে, মা, কাণা ইচ্ছে কেন হতে যাবে?

সজল চক্ষে বৈষ্ণবী ঠাকুর্দ্দার পায়ের ধূলা লইল।

তর্কা। তোমার ভাবনা কি, তুমি তো শিকলি কাটা টে গো; মতির পায়ের বেড়ি ঐ যে দেখ না, একটু নড়তে চড়তেই টান পড়ে।

মতি ইন্দিরার দিকে চাহিয়া হাসিতেছিল। ইন্দিরা আর কিছু বুঝুক আর নাই বুঝুক এ কথা বুঝিল। অন্য সময়ে হইলে রাগিয়া মুখ হাঁড়ি করিয়া বসিত, কিন্তু এতক্ষণের কথার একটা অর্দ্ধ-আস্বাদিত মাধুর্য্য তাহার মনটাকে জুড়াইয়া কেমন যেন আত্মবিস্মৃত করিয়া দিয়াছিল। সে সুপারিকাটা ছাড়িয়া একেবারে সুন্দরীর ঘাড়ের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া বলিল, "দিদি, আমিও সন্ন্যেসী হতে পারি, একবার না হয় আমায় পরখ করে দেখ।"

বৈ। (তাহাকে আদর করিয়া) ছি বোন! ওকথা বলতে নেই, ঠাকুর যদি শোনেন, তোর এমন সোণার ঘর পুড়ে শ্মশান হয়ে যাবে। আমি ছেলে বেলায় বাবাকে হারিয়ে কেঁদে কেটে ওই কথা বলেছিলুম, তাই আমার ঘর ভেঙ্গে গেল।

ম। তুমি সন্ন্যেসী হবে তা'লে আবার ভাত রাঁধবে কে?

ই। তা'তে তোমার মন ওঠে কই!

ম। উঠবে গো উঠবে, সেই শিক্ষাই শিখচি। যতদিন শিখতে পাচ্ছি নে ততদিন নিজের মা স্ত্রীকে পায়ের শেকল বলে বোধ হচ্ছে, আমার আকাশ-ঠেকা পেল্লায় কর্ম্মের বাসনার কাছে এ গাঁটাকে একটা

তুচ্ছ ডোবা বোধ হচ্চে, যে টুকু করচি তার জন্যে শান্তি নেই, কিন্তু যা করতে পারচি নে তার জন্যেই প্রাণটা খাঁ খাঁ করচে।"

বৈ। কিছু করবো ভাবতে গেলে বুকটা যে ধসে যায়? কি করবো গা?

ম। আমারও ঐ দশা। আগে আগে খুব সাহস হতো; উদোম ক্ষ্যাপার মত ভাবতুম দুনিয়াটাকে কেবল একবার বাগিয়ে ধরতে পারলে হয়, তা' হলেই কাদার তালটির মত তার এখানে একটু টিপে ওখানে একটু টেনে মনের মতটি করে নেব আর কি। কিন্তু এতদিন প্রতিকূল হাওয়ায় গুণ টেনে টেনে হয়রান হয়ে সে সাহস ভেঙ্গে গেছে। কেবল ভাবচি যা করছি এই কি ঠিক? কখন মনটা লাফাচ্ছে, আবার কখন বসে পড়ছে, আবার কখন চুপ করে বসে থাকতে আরাম লাগছে, যেন কিছু না করাটাই স্বার্থক করা।

বৈষ্ণবী উঠিয়া পড়িল, বলিল, "চাঁড়াল বৌকে একবার দেখতে যাব, তার বড় অসুখ।" তর্কালঙ্কার অমনি স্থূল দেহখানি কষ্টে তুলিয়া সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন, বলিলেন' "চ' মা, আমিও যাই, ওই পথে পশু ঘরামিকে আমার গোয়ালটা ছাইতে বলে যাব।" বৈষ্ণবীকে যতক্ষণ দেখা গেল মতি চাহিয়া চাহিয়া তাহার সেই নিরাভরণা সচন্দনস্নাতা স্নিগ্ধ মূর্ত্তিখানি দেখিতে লাগিল। ইন্দিরা স্বামীর এ ভাবান্তর আড় চখে লক্ষ্য করিতেছিল, এখন অধোবদনে আস্তে আস্তে বলিল, "দিদি বড় ভাল, না?" মতির উত্তর নাই।

ই। এত রূপ মানুষের হয় না।

ম। শুনেচি বামুনের মেয়ে। চাঁড়াল বৌয়ের কালো কোলো ধুলো কাদা মাখা ছেলেটাকে বুকে করে চুমো খায়। রূপ তো ঢের লোকের আছে, অমন নিখুঁৎ মন কয় জনের হয়?

ই। দিদি বৈষ্ণবী, তাকে সমাজের মুখ চাইতে হয় না। আমি তোমারই স্ত্রী, অমন ধারা কল্লে লোকে জাতে ঠেলবে যে।

ম। পরের জন্যে যে কেঁদেচে তার কি অত কথা মনে আসে? ঠেলে ঠেলুক না, আমি তো আর কখন তোমায় ঠেলবো না।

এ কথায় ইন্দিরা একেবারে জল। সুপারি জাঁতি সব ফেলিয়া আসিয়া স্বামীর কোলে মাথা দিয়া শুইল; ব্যাকুল চক্ষে মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, "সত্যি বল, আমায় কখন পায়ে ঠেলবে না।"

ম। পাগলী আর কি। তবে ধর্ম্ম সাক্ষী করে কি ছাই পাঁশ মন্তর পড়লুম?

ই। তুমি কি দিদিকে ভালবাস?

একথা জিজ্ঞাসা করিতে ইন্দিরার প্রাণান্ত দশা হইল, কিন্তু সে কাঁপিয়া ঘামিয়া আরক্ত মুখে কোন রকমে একবার জিজ্ঞাসা করিয়া না ফেলিয়া থাকিতে পারিল না। মতি কিন্তু এত উদ্বেগ লক্ষ্য করিল না, অতি সহজ ভাবে উত্তর দিল, "ওকে কি কেউ ভাল না বেসে থাকৃতে পারে?" যাহা শুধাইবার জন্য এত তোলাপাড়া, এত মনঃকষ্ট, তাহার উত্তর স্বামী কত হেলায় কি সহজ সরলতায় দিয়া গেল। ইন্দিরা ক্ষণেক কি ভাবিল, তাহার পর বড় সাহস করিয়া স্বামীর পায়ে মাথা রাখিয়া বলিয়া ফেলিল, "তুমি দিদিকে বিয়ে কর।" বিস্মিত মতি হাঁ করিয়া স্ত্রীর এক রাশ চুলের তরঙ্গিত বিসর্পিত কালিমার দিকে চাহিয়া জড়ভরতের মত বসিয়া রহিল। এ কি বলে!

ই। আমার সতীন সহ্য হবে না, কিন্তু দিদি সতীন হ'লে বোধ হয় সহ্য করতে পারি। দিদির বড় দয়ার প্রাণ, যার তার দুঃখে বসে বসে কাঁদে। আমায় কি আর সত্যি সত্যি প্রাণে ধরে দুঃখ দিতে পারবে?

ম। ক্ষেপলে নাকি?

ই। তুমি সুখী হও, তোমার সুখ দেখলে আমার ও সুখ হবে।

মতি রোরুদ্যমানা স্ত্রীকে বড় আদরে চুম্বন করিল, বলিল, "আমি তোমাকে নিয়েই সুখী। মানুষকে ভাল বললে কি বিয়ে না করলেই নয়? তুমি আমার স্ত্রী, সে আমার নারীত্বের আদর্শ; শ্রীরাধা সীতা-সাবিত্রী ভাল বলে কেউ কি তাদের বিয়ে করতে চায়?"

আইডিয়ালিজমের গেঁজেল মতি বড় দুঃসাহসী, তাহার নিকট এ প্রেম এত শুদ্ধ যে নিজের স্ত্রীর কাছেই অকপটে বলিবার। ইন্দিরা কিছু বলিল না, সব কথা বুঝিল কিনা সন্দেহ; কেবল অশান্ত ভক্তির আবেগে নিজের পৃষ্ঠাবলম্বী তরঙ্গিত কেশগুচ্ছে পতির পদদ্বয় বার বার মুছাইয়া দিতে লাগিল। মতি বুঝিল ইন্দিরা কোথায় তাহার নিকট বুঝি মানস-অপরাধে অপরাধিনী; এমনি করিয়া হাতড়াইয়া হাতড়াইয়া যে যাহার জীবন পথ খুঁজিয়া লইতেছে, তাহাকে বাধা দিয়া আর কি হইবে? আগে হইলেও বা বাধা দিত, এখন সে দুঃসাহস মতির নাই। ইন্দিরার মত মেয়ে যদি কখন আপন সাধ্যে পহুঁছায় তবে হয়ত দয়িতের পদপূজা করিতে করিতেই পঁহুছিবে। একদিন ছিল যখন আদর্শের পাগল অসহিষ্ণু মতি অন্য শিক্ষা দিবার ব্যর্থ আয়াস করিয়া বড় দুঃখই পাইয়াছিল। এখন সে অহঙ্কার ধূলা হইয়া গিয়া মতি বাঁচিয়াছে, সে চুপ করিয়া ঘটটির মত বসিয়া রহিল।

মনের মত করিয়া নির্ব্বিবাদে পতিপদ বন্দনা করিয়া ইন্দিরা মুখ তুলিল, বলিল, "এবার সত্যি বলচি, আমি প্রাণপণ করে তোমার কথা শিখবো।"

মতি। আর শিখবে,—আমার যে শেখাবার খাঁই সেরে এল।

ই। তোমার পায় পড়ি, আর একটিবার শেখাও।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

—:*:—

জীবনের আঁকাবাঁকা পথে।

রাধু যাহার জন্ম পাগল সে মেয়ের লাগাল সে পাইল না। না পাওয়ায় দুঃখে আজ তার দিন অচল। এত তৃষ্ণা, আর তাহা তিলার্দ্ধ মিটাইবার উপায় নাই! রাধু জীবনে যাহা কিছু ভোগ্য সকলি কাড়িয়া খাইয়াছে, এমন প্রাণান্তক বিড়ম্বনা তাহার এই নূতন। তাহার আর সহিতে ছিল না। শেষে একদিন সে একটা হেস্তনেস্ত করিবার জন্ম প্রত্যূষে মসীদবেড়েয় যাইতেছিল। পথে দ্বারকেশ্বরের জলে আবক্ষ নিমজ্জিতা বৈষ্ণবীকে দেখিয়া ঘাটে বসিল।

তখন উষা; বনের কোলে সোণায় ডগ্‌ডগে রাঙ্গা থালার মত সূর্য্য সবে উঠিতেছে। গা জুড়ান বাতাস, শিশিরসিক্ত জগৎভরা স্নিগ্ধ সজীবতা, ঘুম-জাগা পাখীর অস্থির মত্ত কাকলী, আর নূতন দিনের চুপি চুপি কথা। সৃষ্টির সে যে কি সাধাসাধি, কি মন-বিনিময়ের আকুলতা তাহা দেখিতে জানিলে এ আনন্দের হাটের বিকিকিনি বুঝি ফুরাইতেই চাহে না। কিন্তু একান্তই একটা কিছুর বিহনে যাহার জীবন বহিবার অযোগ্য হইয়াছে, সে দুঃখের পথের পথিক। এত সহজে পাওয়া সুখে তাহার মনও উঠে না, তাই তাহা দেখিবার কৌশল সে খুঁজিয়াও পায় না। রাধুর মন অপাওয়ার নেশায় মাতাল, সে জগৎভরা সুখ পায়ে ঠেলিয়া তাহাই লইবে, নহিলে মরিবে মজিবে উচ্ছন্নে যাইবে।

বৈষ্ণবী উর্দ্ধমুখে উর্দ্ধনেত্রে যুক্তকরে জলে দাঁড়াইয়া। দ্বারকেশ্বরের

কল্‌কলে ছল্‌ছলে তরল প্রাণ তাহার অঞ্চল লইয়া সেই সুঠাম সিক্ত তনুটির চারিদিকে নাচিতেছে। সে রূপে উষার রূপ বাড়িয়াছে—আরও প্রাণ কাড়া হইয়াছে, প্রকৃতির নিথর সোহাগ ভাবের ভারে টলমল করিতেছে। এ যেন ঐ উষাস্ফূর্ত্ত শান্তিরই একখণ্ড নিবিড়তা, উহারই বড় আপনার, ঐ শান্তিরসাক্ত লীলাবিহ্বল গানের মাঝের রম্‌রমে মিড়; রাধুর ক্ষুণ্ণ ক্ষুব্ধ বাসনার বুঝি সে কেউ নয়।

ঐ ভক্তিরসার্দ্র ভাবটার সঙ্গে রাধুর বড় মন চটাচটি ছিল। রাধু ছাই যখনই আসিবে, একটা না একটা কিছু উপলক্ষ করিয়া পূজার দালানের অষ্টমীর প্রতিমার ঐ জ্বলজ্বলে ভাবটা এ কামনার এমন কাম্যকে ঘিরিয়া দাঁড়াইবে! এ যেন লক্ষ্মণের মন্ত্রগণ্ডী—যেন কি অদৃশ্য বিদ্যুতের ঘের। রাধু চায় সহজ মেয়ে, কামনালাজমুগ্ধ চক্ষু, থর থরে কাঁপা তনু, অবশ তপ্ত বাহু, পাইবার অস্থির কুণ্ঠা! আসিয়া যাহা দেখে, মন দূরে রহিয়া তাহাকে বেড়িয়া হায় হায় করে।

মুখ ভার করিয়া রাধিকাচরণ ঘাটে বসিয়া রহিল। বহুক্ষণ অবধি বৈষ্ণবীর পূজা আর শেষ হইতে চাহে না;—সেই চিত্রার্পিত দশা, সেই ঊর্দ্ধতারক মুগ্ধ দৃষ্টি; যেন পাষাণ প্রতিমা সবে জীবন পাইয়াছে, এখনও গতিশক্তি পায় নাই। অবশেষে সে যখন ধীরে ধীরে জল হইতে উঠিয়া কাছে আসিয়া দাঁড়াইল, তখন রাধু গালে হাত দিয়া মাটির দিকে চাহিয়া বসিয়া আছে।

বৈ। আজ তোমায় ভূতে পেয়েছে, না?

রা। তা' পাক্।

বৈ। আমি ও ভূতকে চিনি! এমন দশ বিশটা শরীর চাইবার আগুনে পুড়ে পুড়ে ক্ষয় যাবে কিন্তু ও ভূতের পেট ভরবে না। ওকে ছেড়ে দাও, ও-ও বাঁচুক, তুমিও বাঁচ।

রা। আমার বেঁচে কাজ নেই।

বৈ। দেখ, তোমার কাছে আমার ধর্ম্ম অধর্ম্ম কিছু গোপন রাখতে নেই। আমিও কাদা ঘেঁটেছি; আজ কিন্তু বাবার প্রসাদে আমার সব সমান।

বৈষ্ণবীর নগ্ন অঙ্গখানি বেড়িয়া ফুটন্ত চাঁপার সে মাধুরী দ্বিগুণ করিয়া যেন ছিন্ন অঙ্গবাসখানিও হাসিতেছিল। এ ভয়ঙ্কর কথার কশাঘাতে রাধু বেদনা পাইয়া চাহিতে গিয়া অতৃপ্ত চক্ষে চাহিয়াই রহিল। হউক এ মেয়ে অপবিত্র, তাহার কাছে শুচি অশুচিই বা কি? আর এ রূপের ডাক কি তাহার প্রত্যাখ্যান করিবার সাধ্য আছে! এ অদ্ভুত মেয়ের কিন্তু রাধিকার চক্ষের সে নির্লজ্জ আক্রমণেও যেন বিন্দুমাত্র আসিয়া যায় না, ঊর্দ্ধে নিম্নে বামে দক্ষিণে চাহিয়া চাহিয়া উষার সেই ফ্রেমেবাঁধান অসীমত্বটুকু প্রাণ ভরিয়া দেখিয়া বৈষ্ণবী সনিশ্বাসে বলিল, "তুমি কি চাও, বল দেখি?"

রা। সে কথা চুলোয় যাক্।

বৈ। গেলে ত বাঁচি। ভাব এ আনন্দের কোন মূল নেই?

রা। নেইই ত; তোমাদের সব বুজরুকি।

বৈ। তবে এ সব কি? কোথেকে এল?

রা। মাটি থেকে।

বৈ মানই যদি তবে এমনতর শুকিয়ে মরে লাভ কি?

রাধিকা মুগ্ধ তন্ময় ভাব হইতে এতক্ষণে খোঁচা খাইয়া সাড় পাইয়া উঠিয়া বসিল. বলিল, "কৈ মানলুম?"

বৈ। মানলে বৈ কি। যে মাটি এত রূপ ধরে এত খেলা খেলতে পারে, সেই অনন্ত সৃষ্টি শক্তিময় মাটিই ত আমার ভগবান্। শুধু তুমি একে নীরস জড় ভেবে শুকিয়ে মর, আর আমি রসময় পরম ধন ভেবে

জুড়িয়ে থাকি। তুমি আমি আনন্দের পোকা, সুখ বিনে দু'দণ্ড বাঁচা দায় হয়; মনেই যখন সে সুখের ভাণ্ডার, তখন তার দোর বন্ধ করে বসে থেকে লাভ কি?

রাধু কি আর উত্তর প্রত্যুত্তর করিতেছিল? সে এই সজলবসন-ক্লিন্ন তনুর চম্পক স্বপ্নটুকু অতৃপ্ত লালসায় রুদ্ধ নিঃশ্বাসে ধড়ফড়ে বুক চাপিয়া দেখিতেছিল। আর এ মেয়ে বিরক্ত হইয়া চলিয়া গেলে তাহার নয়নোৎসব ভাঙিয়া যাইবে ভয়ে আনমনে দুই এক কথায় কথাকাটাকাটি করিতেছিল।

রা। ও মেনে কি হবে?

বৈ। সুখ—অঢের সুখ।

রা। না।

বৈ। তোমাকে এ পথে আসতে হবে।

রা। হুঁ।

বৈ। ঐ যে বল্লুম, তোমাকে আসতেই হবে। আমার পথ তোমারই জীবন।

রা। হুঁ।

বৈ। আমি সেই জন্যে বসে আছি; বড় দুঃখ পাবে, তার পর সেই আনন্দের দুয়ারে আমাদের মিলন।

রা। হ্যাঁ।

রাধুর এ তদগত পূজা দেখিয়া বৈষ্ণবী সনিশ্বাসে বসিয়া পড়িল, তাহার আকর্ণ আয়ত ভাবমাখা চক্ষে ধারা বহিল। অধীর আবেগে আপন মনে সে বলিতে লাগিল, "বাবা, আর যে পারি নে। তোমার জগৎ-জোড়া মায়া, এইটুকু থেকে তুলে নিলে কি সৃষ্টি নষ্ট হয়ে যেত!" বৈষ্ণবীর কান্না দেখিয়া রাধিকা বেদনায় অস্থির হইয়া রাগিয়া গেল,

নিজের পায়ে চড় মারিয়া বলিল, "তুমিই ত যত নষ্টের গোড়া, তুমি সুখের বোঝ কি! যত সব বুজরুকি!"

বৈষ্ণবী রাধুর গায়ে হাত দিল। রাধুর বুকে ঢেঁকির পাট পড়িতেছিল; সর্ব্বাঙ্গে তাহার দরদর ঘাম, গায়ে একরত্তি বল নাই। একটা চাহনীতে পূর্ণ প্রেম-বৃন্দাবন কখন দেখিয়াছ কি? বৈষ্ণবীর চক্ষে এখন তাহাই। সে রাধুর মাথায় হাত দিয়া গদগদ কণ্ঠে বলিতে লাগিল, "একবারটি এ পথ ছাড়, তখন দেখবে আমি কি পর্য্যন্ত তোমারই।—যা' চাচ্ছ ও জিবে রাখতে রাখতে ফুরিয়ে যায়, ঐ পথে এমন আপন জনকে পর করেছ। কোটী শ্রীরাধার সতীসৌভাগ্যের ধন হয়ে তোমার এ কাঙলামো সাজে কি!

আবার সেই দেওয়াল, সেই বেড়া, সেই মন্ত্রগণ্ডী! একে লইয়া এ দেহ-সাধ কেমন করিয়া মিটিবে গো? রাধু আবার রাগিতেছিল।

বৈ। ছিঃ। কশাই দেহ বেচে খায়; যদি আমায় না দিলুম, তোমায় জগৎ ভরে না পেলুম, দেহও যে দু'দিন পর ফিরে আসবে।

এ রকম মনের কথা টানিয়া বলায় রাধু দাঁড়াইয়া উঠিল। বৈষ্ণবীও উঠিয়া চলিয়া গেল, যাইবার সময় বলিয়া গেল, "আমি বলে দিচ্ছি, সেই কিন্তু হদ্দ নাকাল হয়ে তোমায় আসতে হবে। এখন তোমায় কালবৈশাখী ঘিরেছে।" রাধিকার মনোমণ্ডল শেষে সত্য সত্যই কালবৈশাখীতে ঘিরিল! আঁধি যেমন ধূলাপাতা উড়াইয়া গাছ পালা ঘর বাড়ী ভাঙ্গিয়া গোঁ গোঁ সোঁ সোঁ রবে ছুটিয়া আসে, রাধুর দানবে রাগ তেমনি করিয়া আসিল। "যে আমায় চায় না, তার বাঁ পায়ের লাথি খেয়ে এমনতর কেন ঘুরি!"—এই ভাবিয়া রাগে গস্ গস্ করিতে করিতে রাধিকাচরণ গ্রামে ফিরিল। তখনও সবেমাত্র প্রভাত, কামনার দুষ্প্রাপ্য সামগ্রী বৈষ্ণবীকে দেখিয়া যে নীরিকে সে একদিন হেলায় ত্যাগ করিয়াছিল,

আজ রাগের জ্বালায় তাহারই কাছে গেল। এটা বৈষ্ণবীর মনজুড়ান মাধুরী ভুলিবার রাধুর দুরাকাঙ্ক্ষাও বটে, আর কতকটা প্রতিহিংসাও বটে। আজ সে বৈষ্ণবী হইলে হইবে কি; বাল্যের খেলার সাথী সুঁদী এখনও যে রাধুকে ভালবাসে, তাহা সে বুঝিয়াছিল। কেবল এ প্রেমের এমন সৃষ্টিছাড়া ধারাটা বুঝিতে পারে নাই। রাধিকা গায়ে কালী মাখিলে—পাপের ভরা পূর্ণ করিলে তাহা যে সুন্দরীর বুকে নিদারুণ বাজিবে, তাহা বুঝিয়াই রাধুর এতদিন পর এ স্বেচ্ছাকৃত পতন। কিন্তু এ রাগ যে রাগ নয়, এ যে সেই কামনারই ছদ্মবেশ, অত ভালবাসা বলিয়াই যে বঞ্চিতের এত রাগ—সেইটুকু কেবল রাধু বুঝিল না।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

পূর্ব্বকথা—নীরির ঘর।

সুন্দরীর মসীদবেড়েয় ফিরিবার ছয় মাস পূর্ব্বের ঘটনা বলি। বুড়া ভগীরথ জাতিতে নাপিত। নায়েবের অত্যাচারে বর্দ্ধমানে মালোপাড়ার বাস্তুভিটা ছাড়িয়া ভগীরথ মসীদবেড়েয় আসিয়া ঘর বাঁধিয়াছিল। কিন্তু এখানে হলধর ও মাণিক সকলের খেউরী করে, তাই ভগীরথকে জন খাটিয়া খাইতে হয়। দুঃখের দশায় পড়িয়া ভগীরথ তাড়ি ধেনো ধরিয়াছিল। অর্দ্ধাহারে খাটিয়া খাটিয়া গয়না গাঁটি বাঁধা দিয়া ঋণের ভাবনায় ভগীরথের স্ত্রী কাদী যখন মরিল, তখন বুড়া মনের সুখে উচ্ছন্নে গেল।

ফলে বুড়ার তাড়ির মাত্রা অসম্ভব রকম বাড়িয়া গেল। তাহার উপর হঠাৎ নীরির নামে পাড়াময় কলঙ্কের ঢাক বাজিয়া উঠিল! ঢাক বাজিল ইঙ্গিতে ইসারায় চাপা হাসি টিটকারিতে, তাই শব্দ করিল দু'দশটা পাড়া জাগাইয়া। অবশেষে বাপ বেটিতে নিত্য কোন্দল! চোয়াল কণ্ঠা পাঁজর জাগিয়া হাড়গোড়সার ভগীরথকে একেবারে লক্ষ্মীছাড়া দশায় পাইল।

জমিদার-বাটীর ফেরতা সেই যে নদীর ঘাটে রাধুর সহিত বৈষ্ণবীর সাক্ষাৎ হইবার একমাস পূর্ব্বে বৈষ্ণবীর সহিত নীরির ভাব হইয়াছিল। তখন কাদী ইহ জগতে নাই, নীরির নামে মেয়ে মহলে পথে খিড়কীর ঘাটে হেঁসেলে অন্তঃপুরে কানাঘুসা হাসি গা ঠেলাঠেলি সবে আরম্ভ হইয়াছে। পরনিন্দা বড় মৃতসঞ্জীবনী ঔষধ, তেমন তেমন মুখরোচক পরচর্চ্চা

শুনিলে মড়া পর্য্যন্ত উঠিয়া বসে। নিন্দায় যে বিশ্বাস করে যে না করে, দুই দলই এই পরমান্নের লোভে নিন্দিতকে পথে বসাইয়া সরিয়া পড়ে। নীরির হইল তাহাই; তখন কিন্তু বৈষ্ণবী আসিয়া সাধিয়া এ জাতে-ঠেলা মেয়ের সহিত ভাব করিল। একদিন নীরিকে পথে পাইয়া তাহার চিবুকে হাত দিয়া মুখখানা তুলিয়া ধরিয়া বলিল, "তুই না ভাই ভগীরথের মেয়ে নীরি?" নীরি কুণ্ঠিত ভাসা ভাসা কালো চক্ষু তুলিয়া সেই গৈরিক-মণ্ডিতা জগন্মাতারূপ দেখিয়া গড় হইয়া পায়ের ধূলা মাথায় দিয়া কাঁদিয়া ফেলিয়াছিল। হউক পতিতা, এমন অসহায়া আশ্রয়ভিখারী মেয়েকে কি না ভালবাসিয়া পারা যায় গা? সেইদিন হইতে এই কলঙ্কের ভাগিনী চিরবঞ্চিতাকে বৈষ্ণবী ভালবাসিল।

দেখা করিবার আগে নীরি ছিল বৈষ্ণবীর বড় জ্বালা ও অস্বস্তির তাই বড় টানের বস্তু, এখন করুণানদীতে সব ধুইয়া গেল। তাহার পর আরম্ভ হইল স্নেহের ও নীতির উৎপীড়ন। যাহাকে ভালবাসি, তাহাকে মনের মত করিয়া গড়িব—যে ভাল তাহার এই এক অহঙ্কার!

একদিন দ্বিপ্রহরে নীরি ও বৈষ্ণবী ঘরে বসিয়া কথা কহিতেছে। বাহিরে জুতার শব্দ হইল। কে আসিয়া সন্তর্পণে উঁকি মারিয়া গেল, সে বেশ সুপুরুষ; তাহার পরিধেয়ের বড় পারিপাট্য। নীরির মাথা সেলাইয়ের কাঁথাটার উপর ঝুঁকিয়া পড়িল।

বৈ। ও কে রে?

না। কে জানে, কে? বুঝি বাবার খোঁজে এয়েছেল!

সে দিন আর সোজা সরল চোখে নীরি তার এত আদরের রাঙাদি'র দিকে চাহিতে পারিল না। বৈষ্ণবীও সব বুঝিল, কেবল কিছু বলিল না; সে রাধুকে চিনিয়াছিল।

তাহার পর আর একদিন যেখানে বাঘের ভয় সেইখানে রাত হইল। সন্ধ্যার ঘোরে মশান চরের পথে গ্রামান্তরে যাইতে বাঁশ ঝাড়ের মধ্যে কাহাদের ফিস্ ফিস্ কথা শুনিয়া বৈষ্ণবী দাঁড়াইল। এ বড় দজ্জাল মেয়ে, ভয় কাহাকে বলে জানে না। শুষ্ক পত্রের কচর কচর শব্দে বোধ হইল একজন চলিয়া যাইতেছে। নীরি বাহিরে আসিয়া চমকিয়া প্রথমটা পালাই পালাই করিয়া শেষে ইতস্ততঃ ভাবে কাছে আসিল, কাঁপা গলায় বলিল, "রাঙাদি" যে! গাঁয়ে গেছিলে নাকি গা? মশান চরের বিলে উন্নুনের লেগে এঁটেল মাটি নিতে এয়েছিনু।"

তাহার সযত্নে বাঁধা খোঁপা, পরণে ধোবদস্ত কালাপেড়ে সাড়ী, কপালে কাঁচ পোকার টিপ, সে নাকি মাটি আনিতে গিয়াছিল! আঁচল খানা গলায় জড়াইয়া হাত দু'খানা বুকের উপর দিয়া কাঁধে রাখিয়া জড়সড় ভাবে নীরি দাঁড়াইয়া নখে মাটি খুঁড়িতেছিল। তাহার হাত ও আঁচল জোর করিয়া সরাইয়া বৈষ্ণবী দেখিল নীরির গলায় একগাছা সোণার চেনহার চিকচিক করিতেছে! তাহার সীথায় সঙ্গোপনে দেওয়া একটুখানি ক্ষীণরেখায় সিন্দুর!! হায় রে সিন্দুর! অভাগিনী হিন্দু-নারীর জীবনে এত সকল দুঃখভরা এমন শরণদায়ী অথচ এত দুর্লভ আর কি আছে! তোমার জন্য নারী কি না করে? হেলায় চিতার জ্বলন্ত মরণে প্রবেশ করে, আবার হেলায় সর্ব্বনাশা কলঙ্কের ডালি মাথায় নেয়।

বৈষ্ণবী বলিল, "আমার সঙ্গে আয়।" নীরি মন্ত্রাবিষ্টের মত চলিল। এ মেয়েকে তাহার এত ভয় কেন? কি জানি বাপু। রূপে রাজরাণী স্নেহে সখী কি শান্ত অন্তররসে মিঠা এই অপূর্ব্ব মেয়ের পায়ে নীরির মত অনেকে আত্মবিক্রয় করিয়া ফেলিয়াছিল। মকর

ঘাটার শিবমন্দিরে সেই চন্দন নৈবেদ্যের গন্ধে সেই পূত স্নিগ্ধতায় সেই ভক্তি গরগর আবির্ভাবের মধ্যে দুইজনে পাশাপাশি সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিয়া উঠিল।

বৈ। ঠাকুরবাড়ীতে দাঁড়িয়ে আছিস্ ,এইখানে কথা দে তার মুখ আর দেখবি নে।

নীরি নিরুত্তর। অনেক সাধ্যসাধনার পর সে কাঁদিয়া তাহার রাঙ্গাদি'র পা জড়াইয়া ধরিল। তাহার রিক্ত জীবনের সাধের কলঙ্ক এমন করিয়া কাড়িয়া ছিনাইয়া লইলে সে বাঁচিবে কি লইয়া?

বৈ। ও বড় সর্ব্বনেশে পথ, বোন। তুই নিজেও মজবি আর তারও নাম পাঁকে ডোবাবি। এ যে তার খেলা, তোর মান ইজ্জত সুখ-সাধ সব নিয়ে দু'দিনের নিষ্ঠুর খেলা। যে দিন তার সাধ মিটবে সে দিন তোর দাঁড়াবার ঠাঁই হিঁদুর ঘরে নেই, সে দিন বড় কাঁদতে হ'বে বোন।

অনেক কান্নাকাটির পর কিসে কি হইল নীরি বুঝিল না, চন্দন বিগ্রহের পাদপীঠ স্পর্শ করিয়া মৃদু জড়িত স্বরে শপথ করিয়া জীবনের সর্ব্বস্ব বিসর্জ্জন দিল। মানুষ কতবার আপনার সহিত এমনি ছলনাই করে—যাহা দিবার নয় তাহা দিবার অভিনয় করিয়া ভাবে, "এই ত কিছুই দিতে বাকি রাখি নাই।" তাহার পর এই অপূর্ব্ব সখীদ্বয় পথে চলিতে চলিতে এক অপূর্ব্ব মিলনের ছবি সৃষ্টির পটে আঁকিল, তাহার মধ্যে বৈষ্ণবী সেই তরল চাঁদিনীতে ডোবা মেঠো পথে মধু বন্যা ঢালিয়া গাহিতেছিল,

"মাধব এ কঠিন পিয়াসা!
লাজ-শরণ তুঁহু মরণ-বরণ বঁধু
তুঁহু সুখময় সব-নাশা!"

সে উদাস করুণ ভরা রাগে চিত্ত নিঙাড়িয়া যেন রুধির বহায়, জগৎ-

সংসার যেন কত গুমট দুঃখে কালো অশ্রুম্লান করিয়া আনে। বৈষ্ণবীর সঙ্গ আজ নীরির জীবন পথে এক অদ্ভুত চিত্ত-জুড়ান সকল-ভুলান ভয়-ভক্তিভাব-ডুবান জিনিস,—এ যেন তাহার কতই অশুচি মলিন দেহ লইয়া সন্তর্পণে মুখ বাড়াইয়া অগুরু-ঘৃত-সুগন্ধি কোন্ দেউলে এক অচিন্ত্যপূর্ব্ব আবির্ভাবের আশায় থাকা!

তাহার পর বৈষ্ণবীকে পাইয়া অবধি রাধু নীরির ছায়া মাড়ায় নাই, নীরিও পথে ঘাটে অতৃপ্ত চক্ষে তাহাকে আসিতে যাইতে দেখিয়াছে, ডাকিয়া কথা বলে নাই। কিন্তু অতকাল বৈষ্ণবীর পশ্চাতে ঘুরিয়া ঘুরিয়া অবশেষে প্রত্যাখ্যাত হইয়া যখন রাধু সে দিন সকালে নীরিকে ডাক দিল, তখন অভাগিনী দয়িতের এ অযাচিত ডাকে আকবরী প্রণয়রসার্দ্রা হইয়া সব ভুলিল। একে পিছল পথ, তায় খাড়া উৎরাই, তাহার উপর এই প্রাণকাড়া টান। তোমরা ধর্ম্মধ্বজীরা যাই বল, এ দশায় সামলাইয়া লইবার মত কঠিন মনোবল অল্প জনেরই আছে। সংসারে মানব-কবি পদ্মের মধুগন্ধরূপের বাহার লইয়াই পাগল, কমলের কাঁটা পাঁক ও সাপের বেষ্টনীর কথা কেউ বলে না। অথচ কেমন নিঃশব্দে সেইজগৎ-কবি কণ্টকে সর্পে বেড়িয়া পাঁকের উপর রূপের ডালী অমন পদ্মটি ফুটাইতে ব্যস্ত!

বৈষ্ণবী এ কথা তাহার গুরুর কাছে শিখিতেছিল, অলখনাথ বলিতেন, "ওগো ভাল মন্দের মুদী! সহজ হও, ভাল মন্দ সব সেই অখণ্ড রসবিচিত্র মহাকাব্য। ভাল মন্দ—তার ঐ দু'টি উদ্ভিন্ন ওষ্ঠ না পেলে এ মন-ভরা চুম্বন দিব কোথায়?" লীলা-দর্শনের এই আনন্দ-দৃষ্টি পাইতে শিখিতে না শিখিতে বৈষ্ণবী শুচিতার অহঙ্কারে পথ হারাইল, তাই আজ রাধুকে প্রত্যাখ্যান করিয়া নরকে ঠেলিয়া দিল।

একদিন সকালে উঠিয়া ভগীরথ এক গাছা বাঁকারি লইয়া মেয়েকে

ঠেঙ্গাইতেছিল, চেঁচাইয়া বলিতেছিল, ওরে আঁটকুড়ির ঝি! বাপের সঙ্গে চোপা! পয়সা নেই বটে, রোসো হা—

কে পিছন হইতে হাতের বাঁকারি খানা কাড়িয়া লইতে সে হেঁচকা টানের ঝটকায় বুড়া উল্‌টিয়া পড়িতে পড়িতে রহিয়া গেল। রাঙ্গাদি'কে দেখিয়া মুখের কদর্য্য গালি অসমাপ্ত রাখিয়াই ভগীরথ উঠানে গিয়া জড়সড় হইয়া বসিল। তাহার শিরায় ভরা অস্থিচর্ম্মসার হাত পা তখনও উত্তেজনায় ঠক ঠক করিয়া কাঁপিতেছিল। নীরির সর্ব্বাঙ্গে ও এলো চুলে ধূলা, পিট বুক রগ কপাল বাঁকারিতে কাটিয়া গিয়াছে।

বৈ। আ মোলো! মেয়েটাকে মেরে ফেলবি নাকি? তোর লজ্জা সরম কোথায় গেল? মেয়ে যে লক্ষ্মী, তার গায়ে হাত দেয়!

রাঙ্গাদি'র আশ্রয় পাইয়া আরও উথলিতশোকে নীরি কাঁদিয়া উঠিল। বৈষ্ণবী তাহার রোগা শরীর বুকের মধ্যে লইয়া সেইখানে মাটিতে বসিল, তাহার গায়ে হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিতে লাগিল, "ছি ছি! মেয়ে মানুষ যে ঘরের লক্ষ্মী গা! মেয়েদের অনাদরেই ত এমন হাভাতে দশা হয়; আহা কাদী নেই, তাই তুই এমন পশু হইচিস্।"

ভগী। হেই বোষ্টমীদি, তুমি জান না; আমার কাদী মরা অবধি ঐ ছুঁড়ী আমার ঘর পেত্নীর বাথান করেছে। আমি কি কম দুঃখে মারি।

রাগের জ্বালায় তোৎলাইয়া তোৎলাইয়া কোন রকমে এই কয়টা কথা বলিয়া ভগীরথ ভেউ ভেউ করিয়া কাঁদিয়া উঠিল।

সেদিন বৈষ্ণবী নীরিকে বুকের মধ্যে লইয়া শান্ত করিল, আদর করিয়া বড় যত্নে চুল বাঁধিয়া দিল। তাহার পর নিজে দাঁড়াইয়া পাক করাইয়া ভগীরথকে বলিল, "যা', চান করে আয়।" ভগীরথ দাওয়ায় বসিয়া ম্লানমুখে তামাক খাইতেছিল, মুখ না তুলিয়াই বলিল, "আজ

খাব নি। কাদী গেছে, আমার কি আর কোন দিকে সুসার আছে ?" বুড়া আবার কাঁদিয়া উঠিল। বৈষ্ণবী বুড়াকে বকিয়া ঝকিয়া আহারে বসাইয়া বেলা দুইটার সময়ে চাঁড়াল বৌএর ওখানে গেল। তাহার নিকট গালি গালাজ খাইয়া অপর্য্যাপ্ত স্নেহ পাইয়া বাপে ঝিয়ে ভাব হইয়া গিয়াছিল, ভগীরথ খাইতে খাইতে বলিল, "আহা! দি'মণির স্বভাব আমার কাদীর মত, তারও গে ওমনিতর মুখ তেতো আর মনটি চিনির ওলার পারা মিঠে ছ্যাল। নীরু আর তোরে আমি মারবো নি, আমার তাড়ি গাঁজার হক্কির পয়সা ফরক করে রাখিস্।"

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

ঃ*ঃ-

আত্মঘাত—সতী—খুন।

ইহার দুই দিন পর সন্ধ্যার ঘোরে রাধু যাইতেছিল, অন্ধকার হইতে হাত বাড়াইয়া কে তাহার উত্তরীয় ধরিয়া টানিল। রাধু বিরক্ত হইয়া দাঁড়াইল, নীরিকে দেখিয়া বলিল, "কি?" নীরির চক্ষু পদনখে, কণ্ঠ ধরাধরা, সে কষ্টে ক্ষীণ স্বরে বলিল, "তিন দিন কোথা ছিলে?"

রা। কাজ ছিল।

অনেকক্ষণ হইয়া গেল, কাহারও মুখে কথা নাই। রাধু এক পা দু' পা করিয়া চলিয়া যায়। তখন মোরিয়া হইয়া নীরি কাতর কণ্ঠে বলিয়া উঠিল, আমায় এ-দশায় আথান্তরে ফেলে চলে গেলে! আমার একটা মাথা গোঁজবার ঠাঁই করে দিয়ে যাও, নইলে আমি, গলায় দড়ি দেব।"

রা। তোমার ঐ কেমন পেনপেনে স্বভাব, আমার ভাল লাগে না। আম্যর এখন অনেক কাজ আছে।

রাধু চলিয়া গেল। হতভাগী সেইখানে বন বাদাড়ের মধ্যে লুটাইয়া কাঁদিতে লাগিল।

পরদিন উষার এয়োত্তের সিন্দুর আভা পূর্ব্বাকাশে ছড়াইবার পূর্ব্বে বৈষ্ণবী দ্বারকেশ্বরে স্নান করিয়া ফিরিতেছিল। নিংড়ান ভিজা কাপড় কাঁধে কলসী কাঁখে ঘরে ফিরিতে পথে দাঁড়াইয়া শুনিল গ্রামের মধ্যে

কোথায় ক্রন্দনের উচ্চরোল উঠিতেছে! তখনো সংসারের ছবি নৈশ তমিস্রায় মলিন; নিশার বাহুবন্ধনে জগৎ ঘুমে কাতর; সে স্তব্ধতার বুক চিরিয়া সে রোল বড় ভয়প্রদ বড় প্রাণ-উদাস-কর। শিশিরে ভিজা ঘাসের বনে কলসী ও কাপড় নামাইয়া রাঙ্গাদিদি উর্দ্ধশ্বাসে ছুটিল। ভগীরথের তুয়ারে আধ আলো আধ আঁধারে জড়ান হিজিবিজি, সব যেন আবিলতায় ঘোর ঘোর, তাহার মধ্যে তালগোল পাকান ছায়া পিণ্ডের মত কালো কালো অগণ্য মানুষ যাতায়াত করিতেছে। ঘরের বাহিরে দাওয়ায় উঠানে অনেক লোক, সকলেই গণ্ডগোল বকাবকি করিতেছে, আর তাহার মাঝে সকল শব্দ ডুবাইয়া বুড়ার পাষাণ-দ্রবকারী আর্ত্তনাদ উঠিতেছে। বিধু নাপিতানীকে কাছে পাইয়া তাহার গা ঠেলিয়া রাঙ্গাদিদি জিজ্ঞাসা করিল, "কি লো, হয়েচে কি?" সে শুষ্ক ফ্যাকাসে মুখে ঢোক গিলিতে গিলিতে অঙ্গুলি-সঙ্কেতে উঠানের কোলে সজনা গাছটা দেখাইয়া দিল। বৈষ্ণবী ত্বরিত পদে কাছে গিয়া সত্রাসে কণ্টকিত শরীরে দেখিল নীরির সাদা সাড়ীপরা নিরাভরণ দেহ গাছের ডালে ঝুলিতেছে। অভাগিনী রাত্রে উদ্বন্ধনে মরিয়াছে। নীরির পিঠভরা এলোচুল, চক্ষু ও জিহ্বা বাহির করা; নব-উষার মরা আলোয় সে লোলরসনা অশিবা মূর্ত্তি বড় পাংশুল বড় শোকাবহ দেখাইতেছে। বুড়া তখনও বিনাইয়া বিনাইয়া কাঁদিয়া বলিতেছে, "মা আমার, রাগ করে কোথা গেলি রে, নীরিরে—এ—এ-এ, আমার অন্ধের নড়ি রে—এ—এ—এ।"

পুলিশ তদন্তের পর এক বিষম কাণ্ড ঘটিল। এই মেয়ের মরণ লইয়া গোপীনাথপুরের সমাজ ভগীরথকে একঘরে করিয়াছে। হতভাগী যখন মরিয়াছে তখন তাহার পাঁচ মাসের গর্ভ, যে লজ্জা হইতে মুখ ঢাকিতে তাহার গলায় দড়ি দেওয়া, আত্মঘাতের মরণ কিনা সেই কলঙ্ক লইয়া

আর কোথায়ও রটাইতে বাকি রাখিল না। তাহার পর পোড়াইবার মানুষের অভাবে শব পড়িয়া রহিল, হাটে বাজারে দোকানে হরিসভায় মোড়ল সমাজপতিদের চণ্ডীমণ্ডপে বৈঠকখানায় সকলে তামাক খাইতে ঘোঁট পাকাইতে বসিয়া গেল মতির হাঁক ডাকে কেহ কাসিল, কেহ বা আমতা আমতা করিয়া মাথা চুলকাইল, অনেকে "চলুন আসচি" বলিয়া আসিল না। বেলা একটার কিছু পূর্ব্বে মতি আসিয়া দেখিল অভুক্ত দশায় রাঙ্গাদিদি ভগীরথের দাওয়ায় তেমনি বসিয়া আছে। মতির মুখের দিকে চাহিয়া সে জিজ্ঞাসা করিল, কি হ'লো ?"

ম। কেউ এলো না।

তখন জমীদার মতি গ্রামের তর্কালঙ্কার ঠাকুর ও বুড়া ভগীরথ সেই কলঙ্কিনীর শব দেহ কাঁধে করিয়া অচল পাপভীত গ্রামের মধ্য দিয়া শ্মশানে লইয়া গেল ; সঙ্গে গেল রাঙ্গাদিদি। নাপিতের সদ্গতি করিল ব্রাহ্মণ ও কায়স্থে মিলিয়া। যখন শব পুড়িয়া ছাই হইল তখন সন্ধ্যা হয় হয়। চিতা নিভাইয়া স্নানান্তে ভগীরথ বাড়ী গেল। রাঙ্গাদিদি কিছু পূর্ব্বেই চলিয়া গিয়াছিল। পথে মকরঘাটার শিবমন্দির ; মতি ফিরিতে সবিস্ময়ে দেখিল কে পথে উপুড় হইয়া পড়িয়া মাটিতে লুটাইতেছে। সে থমকিয়া দাঁড়াইয়া চিনিল রাঙ্গাদিদি। কাছে জনমানব নাই ! ডাকিয়া সাড়া না পাইয়া মতি হুইয়া মুখ তুলিয়া দেখিল, নাড়ীর গতি পরীক্ষা করিল, তাহার পর কোলে তুলিয়া লইয়া মন্দিরের দিকে চলিল। সচরাচর শান্ত-স্বভাব দৃঢ়চিত্ত মতির বুকে আজ অন্ধ ঝড় ! মুখ তুলিয়া সে যে কি দেখিয়াছিল ! সেই এক নিমেষের প্রচণ্ড রকম নূতন করিয়া দেখায় স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতাল টলিয়া মধুপ্লাবনে তলাইয়া গিয়াছে। যাহাকে রোজ কতবার কত ভাবে সহজ স্নেহে দেখিয়া আসিয়াছে, আজ মতির মন চক্ষু স্পর্শেন্দ্রিয় অযাচিতে অজ্ঞাতে সহসা তাহারই সহিত না বলিয়া

কহিয়া একি সর্ব্বনাশা সম্বন্ধ পাতাইয়া বসিল! এক একটা মানুষ যাহার রূপগুণ সাহচর্য্য নিতান্ত সহিয়া গিয়াছে হঠাৎ কোন এক ক্ষণে মনের শুভযোগে তাহারই চেনা আকৃতি হাবভাব নূতন করিয়া মারাত্মক রকম মিঠা লাগে, আবার কখন বা না বলিয়া কহিয়া অতিবড় বিরস হইয়া যায়। মতির আত্ম-সংযমের সব গর্ব্ব বল আজ রসাতলে গেল। ক্রোড়স্থ সেই কাঞ্চনপ্রতিমা উন্মুক্তদ্বার দেউলের মধ্যে পুষ্পচন্দনচর্চ্চিত শিব-লিঙ্গের পাদপীঠতলে নামাইয়া মতি অন্য দিকে মুখ করিয়া হেঁট মুখে বসিয়া পড়িল। দ্বারান্তরালে রহিয়া জ্বালারক্ত চক্ষু পাকাইয়া এ দৃশ্য কে দেখিতেছিল, এখন সে সরিয়া গেল। শ্মশান হইতে এই লোকটা ছায়ার মত ইহাদের পিছে পিছে ঘুরিতেছে।

এতদিন পর আজ দরবিগলিতধারে যুক্তকরে মতি বলিতেছিল, "হে জগন্নাথ! মায়ার রাজা! আমার একি করলে? হে ঠাকুর! এ মায়া সম্বরণ কর; আমি মরবো, ইন্দিরা মরবে"। হায় রে মায়ার পুতুল মানুষ! এই বল লইয়া তোমার সমাজ-সংস্কার জনহিতের গর্ব্ব।

জ্ঞান হইয়া রাঙ্গাদিদি উঠিয়া বসিলে মতি তাহার দিকে চাহিতে পারিল না, অপরাধীর মত মাটির দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কি হয়েছিল?"

রাঙ্গা। জানি নে, বাবাকে ডাকতে ডাকতে ঐ রকম হয়ে গেল।

রাঙ্গাদিদি উঠিয়া গলায় আঁচল দিয়া বিগ্রহকে প্রণাম করিল, তাহার পর বসিয়া গুণ গুণ করিতে করিতে গান ধরিল,—"তাতল সৈকতে বারিবিন্দু সম সুতমিত রমণী সমাজে"—হঠাৎ থামিয়া বলিল, "আমি ওকে ভাল করতে গিয়েছিলুম, আমার দর্প ভাঙ্গতেই হতভাগী ম'লো।"

মতি। সে তো ভালই করেছিলে।

রা। মনে যার পাপ, তাকে দিয়ে ভাল হবে কেন? নীরি আমার

চেয়ে নিষ্পাপ ছিল, অথচ সেই কিনা শেষটা আত্মঘাতে ম'লো। আমরা ভাবি ভাল কচ্চি ; কি যে কচ্চি ভগবান অন্তর্যামীই জানেন। তখন যদি বুঝতাম এ আমার পতিতার উদ্ধার নয়, এ অতিবড় স্বার্থ-সাধন।

দুই বাহুর মধ্যে তাহারই এত দিনের কাম্যরূপপুত্তলি কোলে করিয়া কম্পিত দষ্ট অধরে ক্ষুধার্ত্ত চক্ষে চাহিতে চাহিতে মতিকে মন্দিরের দিকে যাইতে দেখিয়াছিল রাধিকাচরণ। অনেক কারণে সে মতিকে দু'চক্ষে দেখিতে পারিত না। তাহার উপর বৈষ্ণবী মতির সঙ্গিনী, তাই রাধুর বড় হিংসা, বড় অভিমান। অধিকন্তু সকালে নীরির মৃত্যু ঘটনা জানা অবধি রাধুর প্রাণে অনুতাপ আত্মগ্লানি সঙ্কোচ বেদনা মিলিয়া কেমন একটা গুরুভার তীব্র তাপের সৃষ্টি করিয়াছিল। তাহার পর এই দেখা হইল বোঝার উপর শাকের আঁটি। হঠাৎ তাহার পায়ের তল হইতে কঠিন পৃথিবী টলিয়া গেল।

কে জানে কত বন বাদাড় খানা ডোবা কেমন করিয়া ডিঙ্গাইয়া অনির্দ্দিষ্ট লক্ষ্যহীন ভাবে ঘুরিয়া ঘুরিয়া নিয়তির অলক্ষ্য টানে রাধু যখন দ্বারকেশ্বরের অন্ধকার ঘাটে আসিয়া দাঁড়াইল, তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া সবে নিশা জগৎ সংসারে অমাবস্যার কালী ঢালিয়া জগচ্চিত্র মুছিয়া দিতেছে। ঘাসের উপর জোনাকি, আকাশে থরথরে কাঁপা তারা, গাছের পাতার মাঝে সরসর খস্ খস্ মর মর শব্দ। ঘাটে দুইজন স্ত্রীলোক জল তুলিতেছিল ; ভরা কলসী কাঁখে ঘাটে উঠিতে সম্মুখে হঠাৎ সেই দীর্ঘাকার মূর্ত্তি দেখিয়া অগ্রবর্ত্তিনী অস্ফুটস্বরে বলিয়া উঠিল, "মাগো!" পিছনের মেয়েলোকটী ভয়তরাসে ভাবে জিজ্ঞাসা করিল, "কে লা ইন্দি?" রাধু এতক্ষণ প্রায় বাহ্যজ্ঞানবিরহিত ভাবে স্তব্ধ দুঃখে দাঁড়াইয়াছিল। ইন্দিরার ত্রস্ত "মাগো" ঐ স্বরটুকু তাহার বুকে গিয়া বিঁধিয়া তাহাকে সজাগ করিয়া দিল। সে হঠাৎ ঝুঁকিয়া তাহাকে জড়াইয়া ধরিয়া কাঁধে

তুলিয়া লইল ; ইন্দরার কাঁখের জলভরা কলসী ঠন্ ঠন্ ঠন্ ঠন্ করিতে করিতে ঘাট বাহিয়া ঝপাৎ করিয়া জলে গিয়া পড়িল। সন্তস্নাতার সিক্ত বসন ও কেশ রাধুর গণ্ডে মুখে স্কন্ধে ক্লিন্নভাবে লাগিয়া রহিল। বর্ষীয়সী সঙ্গিনী এই কাণ্ড দেখিয়া হাঁউমাউ করিয়া জলে গিয়া ঝাঁপ দিল, সঙ্গে সঙ্গে রাধুও বনের দিকে দৌড়িল। পড়িয়া যাইবার ভয়ে ইন্দিরা তাহাকে ধরিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে বড় কাতর বড় ভগ্নস্বরে মাঝে মাঝে কাতরোক্তি করিতেছিল, "ওগো, তোমার পায়ে পড়ি গো, আমায় ছেড়ে দাও গো, বাবা গো, আমার কি সর্ব্বনাশ কল্লে গো।" সে আর্ত্তনাদ—মাঝে মাঝে দম আটকাইয়া সে কাঁদা—রাধুর বুকে ছুরির মত বিঁধিয়া কাটিয়া কাটিয়া বসিতেছিল। প্রথম ডাকেই রাধু ছাড়িয়া দিত, এখন ছাড়িয়া দিলেই সে বাঁচে, কিন্তু এত বড় অঘটন ঘটাইয়া ফিরিবার লজ্জায় ঝোঁকের মাথায় চলিল। এখন এ মেয়ের মুখ দেখা ও ইহাকে মুখ দেখান দুইই বিষম দায় ; কাঁধ হইতে নামাইলেই ইহার মুখ দেখিতে হইবে। সে যেখানে গিয়া মেয়েটাকে ছাড়িল, তাহা দইচকের পথ, কাছেই দ্বারকেশ্বর। ইন্দিরা থরথর করিয়া কাঁপিতেছিল, দাঁড়াইতে না পারিয়া বসিয়া পড়িল, তাহার পর উঠিয়া "মাগো! আমায় নাও গো" বলিয়া নদের জলে ঝাঁপ দিল। ভীত রাধু উর্দ্ধশ্বাসে পলাইল।

অসংযত অব্যবস্থিতচিত্ত খামখেয়ালী লোক একবার বুদ্ধি হারাইলে পড়িতে পড়িতে যে কোথায় গিয়া দাঁড়াইবে তাহা বলা কঠিন। রাধু গাঁয়ের কাছাকাছি আসিয়া দেখিল সেখানে মহা হট্টগোল উপস্থিত। কথাটা কিছু আগে হইতে বলি। সন্ধ্যার মুখে হল্লা উঠিল, "মার মার হৈ হৈ রৈ রৈ!" আজিম সেখের পাকা ধানের ভরা ক্ষেতে বলদ নামাইয়া কে সব আসিয়া মই দিতেছে। এ সংবাদে গ্রামে আর লোকজন রহিল না, ছেলে বুড়া যুবা যে যেখানে ছিল কাস্তে কুড়ুল লাঠি প্রভৃতি যে

যাহা পাইল লইয়া ছুটিল। মাঠে আসিয়া দেখিল সব নায়েবের লোক, সঙ্গে বুধুই মোড়ল আর অগুন্তি পাইক নগদি বরকন্দাজ। আজিম বুধুইয়ের পায়ে পড়িয়া কান্নাকাটি করিতে লাগিল, অনেকে দূরে দাঁড়াইয়া গালি পাড়িয়া ক্ষান্ত রহিল; একজন দৌড়িয়া রাধুর আড্ডায় খবর দিতে গেল। যখন বনের মধ্য হইতে রাধু আসিয়া দাঁড়াইল, তখন নিধির দল আসিয়া পড়িয়াছে। চক্ষের পলকে রাধুর খুন চাপিয়া গেল, তাহার একেবারে উদম ক্ষেপা খেপিবার বুঝি এইটুকুই বাকি ছিল। সে আকাশ ফাটা হাঁকে হুকুম দিল, "মার শালাদের, যেন এক স্নুম্নুন্দিও মাথা নিয়ে না ফেরে।" তাহার পর সে কি ভয়ানক লাঠিবাজী! বুধুই প্রভৃতি সাত জনের লাস ফেলিয়া যখন গুড় গুড়ের পরাজিত দল সরিয়া পড়িল, তখন চাঁদের উপর দিয়া সে রজত থাল কখন ম্লান কখন উজ্জ্বল করিয়া তুলা পেঁজা মেঘের সারি ছুটিয়াছে। আকাশে ঘন ঘটার একটা ওলটপালট, ধরায়ও নিশীথিনী কালো চুলের রাশি সর্ব্বাঙ্গে এলাইয়া পা ছড়াইয়া বুঝি কেশ প্রসাধনে বসিয়াছে।

পুলিস তদন্ত শেষ-রাত্রে মশাল জ্বালিয়া স্বয়ং ম্যাজিষ্ট্রেট করিলেন। একসঙ্গে সাতটা খুন এ অঞ্চলে আজ অবধি হয় নাই। রাধু তখন ফেরার। সেই আলো আঁধারের ছায়াবাজীর মধ্যে রক্তমাখা খুনীর মাঠে যে অসম-সাহসী মেয়ে গিয়া রাধুকে হাতে ধরিয়া তুলিয়া আনিয়াছিল সে বৈষ্ণবী। যেমন জবুথবু হইয়া মাথায় হাত দিয়া বেচারী একা সেই তেপান্তরের মাঠে বসিয়াছিল, তাহাতে এ মেয়ে না থাকিলে সে দিন রাধু ধরা পড়িত। দাদাঠাকুরকে বাঁচাইতে নিধে রাধিকার পায়ের ধূলা লইয়া আসিয়া নিজে ধরা দিয়াছিল, মুখসাপট করিয়া বলিয়াছিল, "ঈশ্বর ঘোষ দারোগা থাকতে কোন্ স্নুমুন্দী নিধের গায়ে আঁচড়টি দেয়।" গঞ্জিকাধূমে বিকল তাহার বুদ্ধি কিন্তু মনের চোর-কুঠুরিতে দুয়ার দিয়া গোপনে

অন্তরের অন্তরে বুঝিয়াছিল, সাত সাতটা খুনের পর এবার আর রক্ষা নাই। সে এখন দাদাঠাকুরের মাথা বাঁচাইয়া নির্ব্বিবাদে নিজের প্রাণটা দিতে পারিলে বাঁচে! সেই ভয়ের তাড়নায় সে ম্যাজিষ্ট্রেটের কাছে সাতটা খুনেরই দায় মাথায় লইয়া গিয়া দাঁড়াইল, ভাবিয়া রাখিল দা'ঠাকুর ধরা পড়িলে সে নিজে—খুন করিয়াছে—বলিয়া স্বীকার করিবে। সারা গ্রামময় যখন পুলিশ রাধুকে খুঁজিতেছিল, তখন চাঁড়াল পাড়ায় মোক্ষর বাড়ীতে একটা অন্ধকার কোণে বসিয়া সে অতৃপ্ত চক্ষে দেখিতেছে, আর সম্মুখে বৈষ্ণবী—আমাদের সেই সেকালের স্থঁদি ঢেকিতে চাল কাঁড়িতেছে। মাথার উপর হাতের লাগালের মাঝে একটা বাঁশ বাঁধা, দুইটি চাঁপার বরণ ভুজলতা তাহার উপর ন্যস্ত—আহা! সে নবনীতমাধুরী বাহুর মাঝে পরম-সুন্দরের কি প্রাণকাড়া ডাক! ঢেঁকির পাটের উঠাপড়ার গতিভঙ্গে স্থঁদির পিঠভরা এলোচুলের তরঙ্গ লীলা-তনুর নৃত্যে দুলিতেছে, বুঝি পদ্মাসনা ঢেউয়ে-দোলা পদ্মের উপর দাঁড়াইয়া মৃদু বায়ু-স্পর্শে নাচিলেও এমন মারাত্মক হয় না। রাধিকা নির্নিমেষ চক্ষে ম্লান আলোয় সেই কমলদলনর্ত্তিতা রতিছবি দেখিতেছিল। রূপ লুকাইতে রূপ দেখাইতে অরূপের ঘোমটা আধখানা তুলিতে গোধূলীর চেয়ে বুঝি আলো-আঁধার আরও সর্ব্বনাশা। আহা! রাধু হৃদয়ে রাখিয়া অনন্তকাল ধরিয়া যদি অমনি দোলাইতে পারিত। হায় রে মায়ার মানুষ, লাগালের বাহির ঐ আকাশের চাঁদই কি তোমার কাছে চিরটা দিন এমনি করিয়া চাহিবার ধন থাকিবে!

রাধুকে আপন হাতে রাঁধিয়া খাওয়াইয়া আপনি অভুক্ত দশায় স্থঁদি রন্ধনশালায় শিকল দিল। রাধুকে লইয়া পথে বাহির হইয়া নিশার আঁধারে আপন মুখ লুকাইবার পর বলিল, "তোমার আর এক দণ্ড এ

গাঁয়ে থাকা হবে না।” রাধু কিছু বলিল না। সুঁদি অনেকক্ষণ পর হঠাৎ জিজ্ঞাসা করিল, “ইন্দি কোথা!” রাধু নীরব।

বৈ। আমায় বলো।

রা। জলে ডুবে মরেছে।

বৈ। আমার গা ছুয়ে বল—

জনশূন্য দ্বারকেশ্বরের তটে আসিয়া মেঘমুক্ত চাঁদ হাসিল। সুন্দবীর চক্ষে সে কি ব্যথার স্তব্ধ করুণ দৃষ্টি। রাধুর বুকে শ্বাস প্রশ্বাস চাপ বাঁধিয়া প্রাণান্ত ঘটাইতেছিল, সে বলিল, “না না না, আমি তোমায় বিনা আর কাউকে জানিনে; তুমি এমন দিনে অমন নিদারুণ কথা ভেবো না। ইন্দি সতী সাধ্বী—”

সুঁদি সেইখানে গলায় আঁচল দিয়া আজ এত দিন পর রাধুর কাছে গড় হইয়া পায়ের ধুলা মাথায় লইল. দাঁড়াইয়া বলিল, “তবু যা’ হবার হয়ে গেছে, তার সংসার জন্মের শোধ ভাঙলো। সে যদি বাঁচে তা’হলে সমাজ তার গলায় দড়ি দেবে, সতীলক্ষ্মীকে বাজারে ঠাঁই দেখিয়ে দেবে। তোমার পরীক্ষার আগুন জলেছে, নির্ভরসা হয়ো না, আমি তোমার কাছে কাছে আছি। এখন যাও নৌকায় বস, রাত থাকতে নৌকা ছেড়ে দিক।”

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

আঘাতে জীবন।

সে দিন মতির বাটীতে উনান জ্বলে নাই। সৌদামিনী ঠাকুরাণী অনশনে আলুথালু দশায় সারাটা দিন ধূলি-শয্যায় কাঁদিয়াছেন, তবু মুখ ফুটিয়া পুত্রবধূকে ঘরে আনিতে বলিতে পারেন নাই। সর্ব্বনাশ! তাহার কি আর জাতি ধর্ম্ম আছে, ইহ পরকাল আছে! একাজ কখন হইবার নয়, যাহাকে পরপুরুষে ছুঁইয়াছে তাহাকে লইয়া ঘর করায় ধর্ম্ম যাইবে, চতুর্দ্দশ পুরুষ নরকস্থ হইবে। সমস্ত গ্রামখানির মধ্যে এই সহজ কথাটা বুঝে নাই রাঙ্গাদিদি, তর্কালঙ্কার ও যাহার স্ত্রীর সর্ব্বনাশ হইয়াছে, সে। আজ এ অঞ্চলের পাঁচ ছয়খানি গ্রাম জুড়িয়া সমাজপতি হইতে আরম্ভ করিয়া কুললক্ষ্মীরা অবধি প্রায় অনাহারে অনিদ্রায় সেই সতীলক্ষ্মীর কলঙ্ক কাহিনী রটাইয়াছে। তাই সতীর সে প্রাণান্তক অপমানের কথা এখন আর কাহারও শুনিতে বাকি নাই। এই মুখরোচক জল্পনা জিবে উলটিয়া পালটিয়া চাখিয়া খাইতে কাহারও বা খোকাকে ভাল করিয়া মাই দেওয়া হয় নাই, কাহারও সম্বরা পুড়িয়া চচ্চড়ি আঁকিয়া গিয়াছে এবং কর্ত্তাদের সন্ধ্যাহ্নিক প্রায় যন্ত্রবৎ অন্যমনে সারিতে হইয়াছে। হরিসভায় নাকি তর্কালঙ্কারে ও গঙ্গানারায়ণে শকার বকার অবধি হইয়া চুকিয়াছে।

ইন্দি মরে নাই, জল খাইয়া অনেকটা ভাসিয়া গিয়া প্রায় রুদ্ধশ্বাস অবস্থায় আপনি বনের মধ্যে আঘাটায় উঠিয়াছিল। তাহার এই কাঁচা

বয়সের স্বামিসুখের সাধ যে এখনও তিলার্দ্ধও মিটে নাই, সে মরিবে কি করিয়া? ডাঙ্গায় হাঁচড় পাঁচড় করিয়া উঠিলে লজ্জায় দুঃখে মরিতে ইচ্ছা করে, আবার জলে মরিবার জন্য ডুবিলে একবার জন্মের শোধ কাহার মুখখানা দেখিতে ভাসিয়া উঠিতে হয়। পাগলী সিক্ত বসনে এক মাথা এক গা কাদা লইয়া সেই দীন দশায় জমিদার-বাড়ীর খিড়কীর দুয়ারে আসিয়া পড়িয়াছিল। সে স্নেহের নীড়ে তাহার স্থান হয় নাই, গ্রামের যে দেখিয়াছে তাহার নিষ্কলঙ্ক তনুর ছায়া হইতে ঘৃণায় সরিয়া গিয়াছে। তাহার পর বৈষ্ণবী চিলের মত আসিয়া তাহাকে ছোঁ মারিয়া উৎপীড়ক ব্যাধের মুখ হইতে সরাইয়া লইয়া গিয়াছে।

এতক্ষণে অভাগিনী ভাল করিয়াই বুঝিয়াছিল, যে, তাহার মরণই ছিল সবার বড় মঙ্গল। হিন্দুর সমাজে বিড়ম্বিতের আর্ত্তের স্থান আছে নরকে, সমাজে কোথায়ও নাই। কিন্তু সুঁদী তাহাকে মরিতে দিল না; ইন্দি তাহার পায়ে আছাড়িয়া পড়িয়া বলিতেছিল, "তোর পায়ে পড়ি, দিদি; আমায় মরতে দে, আমার এমনতর সাঙ্ঘাতিক শত্তুরতা সাধিস নে। আমায় মরে এ আগুন নিবোতে দে।" সুন্দরী অনেক আদর করিল, বুঝাইল যে অপঘাতে মরিতে নাই, তাহার স্বামী দেবতা,—সে তো তাহারি আছে। প্রথম প্রথম পাগলী ইন্দিরা যাহা মুখে আসিল তাহাই বলিয়া রাঙ্গাদিদিকে গালি দিল, আঁচড়াইয়া খিমচাইয়া সুন্দরীকে পাগল করিয়া তুলিল। এই ত তাহার স্বামিসুখের পথের এত দিনকার কাঁটা, এই রাক্ষসীই তাহার কলঙ্কিনী-মুখ স্বামীকে দেখাইতে চায়! সেই তাহার সুখের মরার পথের অন্তরায়। শক্ত মেয়ে সুঁদী রাগমাত্র করিল না, পড়িয়া মার খাইল। বাঘিনীর মত মারিয়া খামচাইয়া মাথা মুড় খুড়িয়া যখন শ্রান্তা ইন্দিরা লুটাইয়া পড়িল, তখন তাহাকে বাহু-বন্ধনে বাঁধিয়া বুকে করিয়া এই মেঠো মেয়ে বসিয়া রহিল।

এ দজ্জাল গেছো মেয়ের সহিত বলে ইন্দি ঘরের বৌ পারিবে কেন? তাহার উপর এ যেন প্রাণকাড়া গানের মত মিঠা, ইহার বুকে যত প্রেম তত বল। নদীর দিকে ইন্দিরার ঘন ঘন ব্যাকুল সতৃষ্ণ দৃষ্টি দেখিয়া সুন্দরী বলিল, "যার বেঁচে শান্তি নেই তার কি মরে শান্তি আছে বোন? মতিদা' আসুক, তারপর তোর যা' ইচ্ছে করিস্।

ই। না না না, এ কালামুখ আর কাউকে দেখাবার নয় গো নয়; কারু এসে কাজ নেই; পাপ দেহটার জন্যে তাকে—সে দেবতাকে আর ঘরছাড়া আপনার জন ছাড়া করিস্ নে দিদি।

দ্বিপ্রহর রাত্রে মতি আসিয়া ধূলায় নিদ্রিতা দীনবসনা স্ত্রীর মাথা কোলে করিয়া বসিল। জাগিয়া লজ্জায় মৃতকল্পা ইন্দি স্বামীকে প্রথমে মুখ দেখাইতে পারিল না, তাহার পায়ে মুখ গুঁজিয়া খুব খানিকটা কাঁদিল; ক্রন্দনরুদ্ধ স্বরে বলিল, "আমি তোমার অযোগ্য, কেবল আমায় মরবার অধিকার দিয়ে যাও।" মতি সমস্ত রাত্র সেই ভাবে তাহাকে বক্ষে করিয়া বসিয়া বড় কঠিন তপস্যাই করিল; এমনি করিয়া বুঝি প্রাণারামের জীবন ফিরিয়া পাইবার জন্য দময়ন্তী নলদেহ কোলে পণ করিয়া বসিয়াছিল। মৃত সতীদেহ স্কন্ধে মহাযোগী বিশ্বম্ভর যে জাগ্রতমূর্চ্ছায় ত্রিলোক ঘুরিয়াছিল, সে মগ্ন সমাধিও বুঝি এমনি উদ্ভ্রান্ত ও তন্ময়।

ঊষার সিন্দুর-লিপ্ত সতীসৌভাগ্য পূর্ব্বাকাশে দেখা দিলে ইন্দিরার মুখ তুলিয়া মতি বলিল, "চলো, ঘরে ফিরে চল। ইন্দি বড় বেগে মাথা ঝাঁকি দিয়া অসম্মতি জানাইল। সে ঘর সে অঙ্গন—সে গোময়লিপ্ত স্বামিপাদপীঠ যে তাহার সতীপীঠভূমি, সেখানে এমন করিয়া দয়া করিবার যে কেবল তুমিই আছ, আর কে সেখানে এমন করিয়া অভাগিনীকে দু'দণ্ড নির্ব্বিবাদে পতিপদ পূজা করিতে দিবে! মতি

বলিল, "চল্, ইন্দি! আমাদের সংসার আবার আমরা পেতে বসিগে; তোকে যে না বোঝে সে সমাজকে ভয় করাও পাপ।

ইন্দি। আমি তোমার অযোগ্য।

ম। তুমি আমার স্ত্রী।

ই। আমায় নিলে তোমার ইহপরকাল দুই যাবে?

ম। তোকে ছাড়লে আমার ধর্ম্ম যাবে, তবে আর অগ্নি সাক্ষী করে কি ছাই পাঁশ মন্তর পড়লুম!

ই। আমি তোমার অযোগ্য।

ম। ওরা যা' বলছে তাই যদি হ'তো, তবু যে তুই আমার মাথায় করে রাখ্‌বার জিনিস। স্ত্রীর অতবড় বিপদে স্বামী ছাড়া কে সহায় হ'বে বল্ দেখি!

ই। না গো না, আমি অত কথা অত দুর্নাম সইতে পারবো না।

ম। তবে চল্ বিদেশে যাই, সেখানে দু'জনে নতুন শান্তির সংসার পাত্‌বো, এ পাপের সমাজকে জাতে ঠেলে আমরা চলে যাই আয়।

ইন্দি এতক্ষণে ধড়মড় করিয়া উঠিয়া এক রাশ চুল মুড়ি পাকাইয়া খোঁপা বাঁধিল, এক গাল হাসিয়া একটু সন্দিগ্ধ আহ্লাদে তাড়াতাড়ি বলিল, "সত্যি যাবে?" মতি স্ত্রীকে চুম্বন করিতে অভাগিনী বড় সুখের জ্বালায় ভরা-প্রাণে কাঁদিয়া ফেলিল।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ।

মিলনের পথে।

তাহার পর সাত বৎসর পরের কথা। এ জগৎ-শিল্পী যেমন অনুপম কারিগর, তেমনি নির্ম্মম। তাহার রং অঢের, ভাব অফুরন্ত, রূপ দিবার চাতুর্য্যের সীমা নাই; তাই সে এমন অবিরাম গড়ে আর মোছে, গড়ে আর মোছে। যে শিল্পী ভাবের কাঙাল, অনেক খাটিয়া রূপের মধ্যে জীবনের রং ফলায়, তাহারি ভাঙ্গিতে মায়া হয়।

নর্ম্মদার তীরে চিত্রকূটে বৈষ্ণবী ও রাধু বসিয়া আছে। দেখ ওদের মাঝেও শিল্পীর তুলি সৃষ্টির আনন্দে খেলিয়াছে। সুন্দরীর ভুবন-ভুলান লাবণীতে যে জৌলস যে ঢল ঢল লালিমা ছিল, তাহা যেন একটু কালো রঙের শীতল প্রলেপে কেমন নিথর মাধুর্য্যে জুড়াইয়া আসিয়াছে,—এ যেন রঙের রূপের গোধুলী। যেন অকূল রূপে কূল দেখা দিয়াছে, কিন্তু ভাবের নদী কূল হারাইয়া সিন্ধুবুকে ডুবিয়াছে। রাধুর দেহ তেমনি বলিষ্ঠ আছে, কিন্তু অস্থিকঠিন শিরাবহুল পরুষ শক্তিতে পাষাণে খোদা মূর্ত্তির মত তাহাতে গাম্ভীর্য্য আসিয়াছে।

দুই জনে কথা হইতেছিল। রাধুর দিকে চাহিয়া চাহিয়া চাহিয়া চক্ষু ফিরাইতে না পারিয়া সুন্দরী বলিল, "তুমি এত কঠিন হ'লে কি করে?"

রা। বড় ভোগ গেছে; তুমি ত জান আমায় কত বড় স্রোত ফিরোতে হয়েছে।

সু। তা' সত্যি।

রা। তুমি বেশ আছ।

সু। কেমন?

রা। বড় সুন্দর! এত শান্তি, এত ভরাট সুখ আমি আর কারু মুখে দেখি নি। সুঁদি, ভাই, আমায় পথ দেখিয়ে দে।

সুন্দরী রাধুর হাতখানি দুই হাতের মধ্যে করিয়া অসঙ্কোচে কোলে লইল, মৃদু হাসিয়া বলিতে লাগিল, "পথ! হ্যাঁ পথই বটে,—তবে সে পথ কেবল ফুরয় না। ফুরোবে কি করে বল দেখি? সেই যে নিজে তার প্রেমিকার পা দু'খানা বুকে ধরে পথ হয়ে ফুরতে চাচ্ছে না! শুধু একবার চেয়ে দেখ ঐ পথ চলাই বুক-ভরে পাওয়া।" রাধু সুন্দরীকে কোলে টানিয়া লইল, বলিল, "আবার আমার সব সাধনা ডুবাতে এলি!"

সু। আমায় চাও, তাই ফুরিয়ে যাই; আমার মাঝে তাকে চাও, দেখো আমি ফুরোতে ভুলে যাব। চাওয়া পাওয়া ভিন থাকবে না, তোমায় কতবার ডেকেছি মনে আছে? কতবার বলেছি "তোমায় এইপথে আসতে হবে।" তুমি ও আসছিলে, ঐ একান্ত তোমারি বাঁকা চোরা পথ দিয়ে তুমি আসছিলে। না এসে যে গতি নেই, আমিই যে তোমার পথ।

রা। এখন ত যেতে চাই; আমায় পথ দেখা ভাই, পথ দেখা।

সু। তোমার জন্যে তোমায় ছেড়ে থাকা সে কি আমার কম দুঃখ। তুমি যদি বুঝতে!

রা। বুঝি, সুন্দরী, এখন একটু বুঝি।

সু। তা'ত বুঝবেই, তুমি না বুঝলে আমার যে সর্ব্বনাশ হয়—জীবন যে বেসুরো বাজে। না না, কেন বলছি বেসুরো? তোমার সব কাদা সব পাপ সব পাগলামী আমার দেহ-চন্দন, আমার অঙ্গবাস,

আমার এই রয়ে রয়ে দহে দহে জুড়োন—এই আমার সাধনা মুক্তি যা' বল সব।

এত বড় তপস্বিনী মেয়ে রাধিকার পায়ে লুটাইয়া পড়িল, কেশ-ভারে তাহার চরণদ্বয় ঢাকিয়া নিশ্চেষ্ট হইয়া মুখ লুকাইয়া রহিল। আর রাধু বসিয়া থর থর করিয়া কাঁপিতে লাগিল। বহুকষ্টে রুদ্ধস্বর ফিরিয়া পাইয়া রাধু যুক্তকরে উর্দ্ধনেত্রে বলিতে লাগিল, "পথ, ওগো জগন্নাথ! পথ দাও। মুর্খ করেছিলে ঠাকুর, পাঁকের কীট করেছিলে ঠাকুর, তবু আমার কিছু বলবার নেই। কেবল এ সাত রাজার দুর্লভ ধন অযোগ্য আমায় দিয়ে একি রঙ্গ করলে ঠাকুর? যদি এমনি ধনে ধনী করেছ, তবে পথ দেও! সেই পথ দেও যে পথে ওর কাছে যাই।"

সুন্দরী উঠিয়া বসিয়া বিপুল কেশভার জড়াইয়া বাঁধিল, তাহার পর রাধুর কোলে দুই বাহু রাখিয়া বলিল, "ইন্দিকে মনে আছে?" রাধু নিরুত্তরে দীর্ঘশ্বাস ফেলিল। সুন্দরী বলিতে লাগিল, "তার এখন দু'টী খোকা হয়েছে, তারা কাশীতে দশাশ্বমেধ ঘাটের কাছে আছে।"

রা। মতিদা'?

সু। হ্যাঁ, দু'জনেই। ইন্দিকে দেখতে ইচ্ছে করে?

রা। করে বই কি? যার অতবড় সর্ব্বনাশ করেছি, তার ঘা' কি ভোলবার? একবার মেয়েটার পা দু'খানা মাথায় ধরবার যে আমার এখনও বাকি আছে।

সু। সর্ব্বনাশ? আহা! কত বড় অহিতের ভেতর দিয়ে কতবড় হিত যে তার করেছ,—তা' সেই জানে। এখন মতিদা'কে সে যেমন করে সতীসৌভাগ্যে পেয়েছে, এমন করে বুঝি হিন্দুর সমাজে সর্ব্বস্ব খুইয়েই পায়।

রা। সে তারই পুণ্যের জোর, তা'তে কি আমার পাপ ছোট হয়?

সু। ভাগ্যিস তুমি অমন দুর্দ্দান্ত ছিলে, তাই আজকের এমন সুখের দিন আমার অদেষ্টে মিললো। চল যাই, আমরা আর দু'জনে দুই ঠাঁই থাকি কেন! চল, আমরাও ইন্দির কাছে ঘর বাঁধি গে।

রা। সুঁদী!

সু। অন্তর জুড়িয়েছে, আর আমাদের এও যা' ওও তা'; চল হাত ধরাধরি ক'রে যে পথ ফুরোয় না জীবনের সেই তীর্থ-পথে যাই।

রা। সত্যি বলছো?

সু। সত্যি, সেই ছেলেবেলা থেকে এমন সুখ দুঃখের যাত্রা দেখো কত আঁকা বাঁকা পথে সত্যি হয়ে এল, তার বড় সত্যি আর কি আছে?

রা। সমাজ? বিয়ে?

সু। এত বড় পরিণয়ের পর আবার বিয়ে? বিয়ে তো বৈকুণ্ঠের কথা, অন্তর-বৈকুণ্ঠে তোমার আমার চেয়ে বড় বিয়ে আর কার হ'য়েছে। দেবতার বিগ্রহকে ফুল ফেলে শুদ্ধ করবে? সমাজও যে এই;—জীবন যে দিকে বয়, সমাজ সেদিকে যে সত্যি হয়ে আপনি গড়ে উঠে। বসন্ত এলে ফুল আপনি ফোটে।

রা। সুন্দরী! সত্যি?

সু। হ্যাঁ, সত্যি বই কি, চলো।

রা। পথ?

সু। পথ তো পেয়েছ। একা আর কত পথ চলবে? এ তো একার পথ নয়, বাঁশীর ডাকের পথ যে মিলনের পথ।

রা। চলো তবে ইন্দির কাছে যাই।

তখন যেমন ছিল তেমনি অবস্থায় দুইজনে হাতধরাধরি করিয়া মিলনের পথে বাহির হইল! রাধুর কঠোর তপস্যার কুটীর কমণ্ডলু ধূনী রুদ্রাক্ষ পিছনে পড়িয়া রহিল! সংযমের নদী ভোগের বৈকুণ্ঠ দিয়া সব-রসের পথে সাগর রচিতে বহিল।

সম্পূর্ণ।